শতাব্দী পুরোনো জেনেটিক রহস্য সমাধান পৃ. ৩০

ডায়ার নেকড়ে কি আসলেই ফিরে এসেছে? পৃ. ২৭

চোখকে বোকা বানিয়ে নতুন রং তৈরি! পৃ. ১৮

বিজ্ঞানবার্তা

সংখ্যা ১, ইস্যু ২

এপ্রিল ২০২৫

ভিনগ্রহে প্রাণ?

সৌরজগতের বাইরের কোনো গ্রহে সম্ভাব্য প্রাণের শক্ত প্রমাণ

পৃ. ২৩

সম্পাদক
তানভীর রানা রাব্বি

সহ-সম্পাদক
সাদিয়া ইসলাম

প্রচ্ছদ
NASA/CSA/ESA/J. Olmsted/N. Madhusudhan

প্রকাশক
বিজ্ঞানবার্তা (bigganbarta.org)
তারিখ: ২ মে, ২০২৫
ইমেইল: editor@bigganbarta.org

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানবার্তা ম্যাগাজিনের এপ্রিল ২০২৫ সংখ্যায় স্বাগত। আমরা আবারও হাজির হয়েছি বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জগৎ থেকে খুঁটে আনা সবশেষ গবেষণা ও আবিষ্কারের গল্প নিয়ে। এই সংখ্যায় আপনারা জানতে পারবেন কীভাবে থ্যালামাস মস্তিষ্কে চেতনার সূচনা করে, আর কীভাবেই বা বিজ্ঞানীরা ইউরেনাস গ্রহের দিনের দৈর্ঘ্য পুনরায় নির্ণয় করলেন। এছাড়াও জানতে পারবেন মাটির গভীরে পাওয়া এক নতুন অণুজীব সম্পর্কে, যা ভবিষ্যতে পরিবেশ সংরক্ষণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

আর নাসার সঙ্গে বাংলাদেশের মহাকাশ চুক্তি কিংবা ফিনিক্স গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের কেন্দ্রের বিশাল ব্ল্যাকহোল—এসবই তো বিজ্ঞানের সীমাহীন জগতের নতুন জানালা খুলে দিবে।

আমরা বিশ্বাস করি, বিজ্ঞানের চর্চা কেবল গবেষণাগারে নয়—পাঠকের চিন্তায়, প্রশ্নে, কৌতূহলে। তাই বিজ্ঞানবার্তা শুধু তথ্য নয়, উৎসাহেরও বাহক হতে চায়।

আপনাদের পাঠ, মতামত ও অংশগ্রহণই আমাদের পথচলার অনুপ্রেরণা। চলুন, একসাথে আবিষ্কারের পথে এগিয়ে যাই।

— সম্পাদক

সূচীপত্র

ফিচার

২৩ দূরবর্তী কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব?

সংবাদ

০৪ মস্তিষ্ক কীভাবে চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে?

০৫ ইউরেনাসে একদিনের দৈর্ঘ্য

০৬ নাসার আর্টেমিস চুক্তিতে বাংলাদেশ

০৭ মাটির গভীরে নতুন অজানা অণুজীব

০৮ ছয় প্রজাতির নরবানরের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স

১২ সবচেয়ে বড় ব্ল্যাকহোল

১৩ নিউট্রিনোর ভর > ০.৪৫ ইলেক্ট্রনভোল্ট

১৪ ভিনগ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের জোরালো প্রমাণ

১৬ বিড়ালের জটিল অরিজিন স্টোরি

১৮ চোখকে বোকা বানিয়ে নতুন রং তৈরি!

২০ প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন্ত কোলোসাল স্কুইড

২১ মেসিয়ার ৮৩ গ্যালাক্সিতে সক্রিয় সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল

২৬ ৫০০ বিলিয়ন বছরে একবার প্রদক্ষিন

২৭ ডায়ার নেকড়ে কি আসলেই ফিরে এসেছে?

২৯ পেস্তা বাদামের জিনোম সিকোয়েন্স

৩০ শতাব্দী পুরোনো জেনেটিক রহস্য

বিজ্ঞান কথা

১০ ডোপামিন

ছবি

৩৬ এপ্রিল মাসের সেরা বিজ্ঞান ছবি

৩২ বিদ্যুৎ পরিবাহী ব্যাকটেরিয়া

৩৪ সবচেয়ে পুরোনো পিঁপড়া

৩৯ সবচেয়ে ঠান্ডা এক্সোপ্ল্যানেট

৪০ নতুন দুটি কুমির প্রজাতি

৪১ পোক্সিয়াও

৪৩ গ্র্যাভিটেশনাল স্লিংশট দিয়ে স্যাটেলাইট উদ্ধার

৪৪ মহাকর্ষ বল কি গণনামূলক প্রক্রিয়ার ফল?

@bigganbarta

@bigganbarta

@bigganbarta

@bigganbartafb

info@bigganbarta.org

bigganbarta.org

স্নায়ুবিজ্ঞান

মস্তিষ্ক কীভাবে চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে?

মানুষের মস্তিষ্কে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল রেকর্ডিং ব্যবহার করে চালানো এক নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, থ্যালামাস — বিশেষ করে এর উচ্চ-স্তরের অঞ্চলগুলো — চেতন উপলব্ধি (কনশাসনেস পার্সেপশান) সূচিত করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। একটি দৃশ্যগত কাজ চলাকালে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে গবেষকরা দেখেছেন, ইনট্রালামিনার এবং মিডিয়াল থ্যালামিক নিউক্লিয়াস প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের আগে সক্রিয় হয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে থ্যালামাস-ই চেতনা শুরু করে।

নিউরোসায়েন্টিস্টরা প্রথমবারের মতো দেখতে পেয়েছেন, মস্তিষ্ক যখন নিজেই নিজের চিন্তার বিষয়ে সচেতন হয় — যাকে "conscious perception" বলা হয় — তখন মস্তিষ্কের গভীরে থাকা কিছু কাঠামো কীভাবে সক্রিয় হয়।

মস্তিষ্ক সব সময়ই নানা রকম দৃশ্য, শব্দ এবং অন্যান্য উত্তেজনার দ্বারা বোমাবর্ষণের মতো আক্রান্ত হতে থাকে, কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র আশপাশের জগতের এক ক্ষুদ্র অংশ নিয়েই সচেতন থাকে — যেমন একটি চকলেটের স্বাদ বা কারও কণ্ঠস্বরের শব্দ। গবেষকরা অনেক আগে থেকেই জানেন যে, মস্তিষ্কের বাইরের স্তর যাকে "cerebral cortex" বলা হয়, তা এই সচেতন চিন্তা অনুভব করার প্রক্রিয়ায় জড়িত।

The Quantum Zeitgeist

তবে মস্তিষ্কের গভীরের কাঠামোগুলোর ভূমিকা বোঝা বরাবরই কঠিন ছিল, কারণ সেগুলোতে পৌঁছাতে হলে লিথাল সার্জারির প্রয়োজন হয়। আর প্রাণীদের উপর এ ধরনের পরীক্ষা চালানোও বেশ জটিল। তবে গবেষকরা বলছেন, এই অঞ্চলগুলো নিয়ে গবেষণা করলে তারা মস্তিষ্কের বাইরের আবরণ ছাড়িয়ে চেতনা নিয়ে আরও বিস্তৃত তত্ত্ব তৈরি করতে পারবেন।

চেতন না অবচেতন

গত ৩ এপ্রিল, ২০২৫ এ Science জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায়, বেইজিং নর্মাল ইউনিভার্সিটির নিউরোসায়েন্টিস্ট মিনশা ঝাং থ্যালামাস নামক মস্তিষ্কের একটি অংশের উপর নজর দেন। মস্তিষ্কের কেন্দ্রে থাকা এই অঞ্চলটি সংবেদনশীল তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কাজের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত, এবং ধারণা করা হয় এটি কনশাসনেস বা চেতনা উপলব্ধিতে ভূমিকা রাখে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা আগে থেকেই দীর্ঘস্থায়ী এবং তীব্র মাথাব্যথার চিকিৎসার জন্য থ্যালামাসে সরু ইলেকট্রোড ইমপ্ল্যান্ট করিয়ে নিয়েছেন। এই সুযোগে ঝাং এবং তার সহকর্মীরা তাদের মস্তিষ্কের সংকেত বিশ্লেষণ করে সচেতনতার পরিমাপ করতে পেরেছিলেন।

অংশগ্রহণকারীদের বলা হয়েছিল, একটি নির্দিষ্ট উপায়ে চোখ ঘোরাতে — নির্ভর করে তারা পর্দায় একটি আইকন ফ্ল্যাশ করতে দেখেছেন কি না। আইকনটি এমনভাবে ডিজাইন করা ছিল, যাতে এটি অংশগ্রহণকারীদের চোখে ধরা পড়ে কেবল অর্ধেক সময়েই।

এই কাজ চলাকালে গবেষকরা থ্যালামাস এবং কর্টেক্স সহ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলের স্নায়বিক কার্যকলাপ রেকর্ড করেন। সিডনির ইউনিভার্সিটি অব সিডনির সিস্টেম নিউরোসায়েন্টিস্ট ক্রিস্টোফার হোয়াইট বলেন, এই প্রথমবার এমন একটি গবেষণায় মস্তিষ্কের একাধিক অঞ্চলের স্নায়বিক কার্যকলাপ একসঙ্গে রেকর্ড করা হয়েছে যা সচেতনতা বিজ্ঞানের জন্য প্রাসঙ্গিক। তার মতে, "এই কাজটা সত্যিই অসাধারণ," কারণ

এটি গবেষকদের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যকলাপের সময়কাল কেমন তা তুলনা করার সুযোগ দিয়েছে।

প্রহরী হিসেবে থ্যালামাস

যখন অংশগ্রহণকারীরা আইকনটি দেখেছিলেন, তখন তাদের থ্যালামাস এবং প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সে যে কার্যকলাপ দেখা গিয়েছে, তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন সেই সময়ের কার্যকলাপ থেকে যখন তারা আইকনটি দেখেননি। সচেতন অবস্থায় থ্যালামাসের কার্যকলাপ কর্টেক্সের তুলনায় আগে শুরু হয়েছিল এবং বেশি তীব্র ছিল, এবং দুটি অঞ্চলের কার্যকলাপ একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সিডনির ইউনিভার্সিটির সিস্টেম নিউরোসায়েন্টিস্ট ম্যাক শাইন বলেন, এটি ইঙ্গিত দেয় যে থ্যালামাস একটি ফিল্টার হিসেবে কাজ করে — কোন চিন্তাগুলো চেতনায় আসে আর কোনগুলো আসে না, তা নিয়ন্ত্রণ করে।

পূর্বের প্রাণী-ভিত্তিক গবেষণাগুলোও এই ফলাফলকে সমর্থন করে। ২০২০ সালের একটি গবেষণায়, গবেষকরা চুম্বকের সাহায্যে ইঁদুরের গোঁফকে এমনভাবে নাড়িয়েছিলেন যাতে ইঁদুররা সেটি অর্ধেক সময় টের পেত। ইঁদুরদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যদি তারা গোঁফের নড়াচড়া অনুভব করে, তবে পানির উৎস থেকে একটি চুমুক নিতে হবে। দেখা গেছে, যখন ইঁদুররা সেই নড়াচড়া টের পেত, তখন তাদের সেরিব্রাল কর্টেক্সের নির্দিষ্ট কোষ সক্রিয় হতো, এবং সেই সংকেত মস্তিষ্কের গভীর অংশে — থ্যালামাস সহ — প্রেরিত হতো।

এখনো প্রশ্ন রয়ে গেছে — এই পরীক্ষাটি কি আসলেই সচেতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত স্নায়বিক কার্যকলাপকে ধরেছে, নাকি শুধুই কোনো উত্তেজকের প্রতি মনোযোগের প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করেছে যা সচেতনভাবে অনুভব না-ও করা হতে পারে?

ঝাং ভবিষ্যতে আরও মানুষের উপর গবেষণা চালানোর এবং ম্যাকাক বানরের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ বিশদভাবে পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা করছেন।

রেফারেন্স: *DOI: [10.1126/science.adr3675](https://doi.org/10.1126/science.adr3675)*

লেখক: জান্নাত শেখ

জ্যোতির্বিজ্ঞান

ইউরেনাসে একদিনের দৈর্ঘ্য

গবেষকরা হাবল টেলিস্কোপের ১১ বছরের ডেটা বিশ্লেষণ করে ইউরেনাসে একদিনের দৈর্ঘ্য ১৭ ঘণ্টা, ১৪ মিনিট, ৫২ সেকেন্ড নির্ধারণ করেছেন, যা ভয়েজার ২-এর আগের হিসাব থেকে ২৮ সেকেন্ড বেশি। নতুন হিসাবটি অনেক বেশি নির্ভুল এবং ভবিষ্যতের মহাকাশ মিশনে ইউরেনাসের অবস্থান বা স্থানাঙ্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

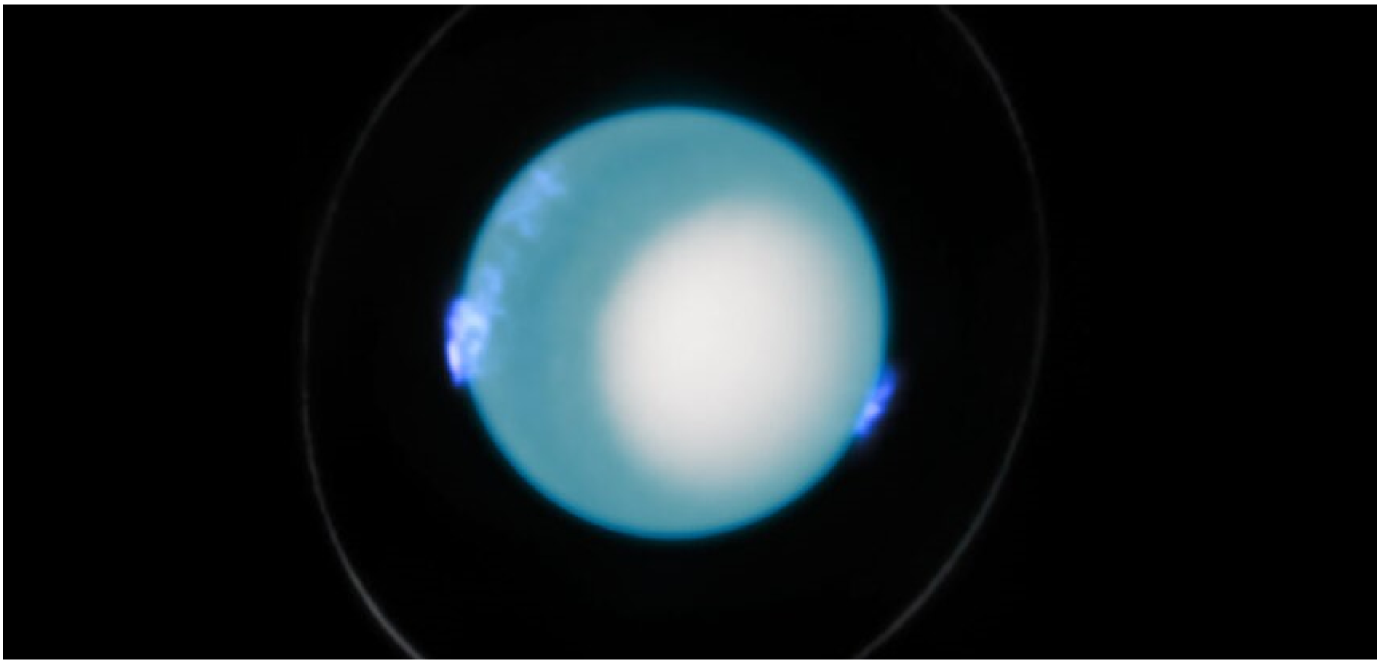

ESA/Hubble/NASA/L. Lamy/L. Sromovsky

হাবল স্পেস টেলিস্কোপের ১১ বছরের পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ইউরেনাসে একদিনের দৈর্ঘ্য ১৭ ঘণ্টা, ১৪ মিনিট এবং ৫২ সেকেন্ড। এটি নাসার ভয়েজার ২ মহাকাশযানের ১৯৮৬ সালের অনুমান থেকে ২৮ সেকেন্ড বেশি। ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল *Nature Astronomy* জার্নালে এই আপডেটেড হিসাব সম্বলিত গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রায় ৪০ বছর আগে, ভয়েজার ২ প্রথম মহাকাশযান হিসেবে ইউরেনাসকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে। তখন মহাকাশযানটির সংগৃহীত রেডিও সংকেত এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের ডেটা বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিদরা ইউরেনাসের একদিনের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করেন প্রায় ১৭ ঘণ্টা, ১৪ মিনিট এবং ২৪ সেকেন্ড।

“জ্যোতির্বিদরা ইউরেনাসের একদিনের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করেন প্রায় ১৭ ঘণ্টা, ১৪ মিনিট এবং ২৪ সেকেন্ড ”

এই ঘূর্ণনকাল ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ইউরেনাসের জন্য একটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা তৈরি করেন। তবে সেই হিসাবের মধ্যে প্রায় ৩৬ সেকেন্ডের অনিশ্চয়তা ছিল, যা প্রতিটি ইউরেনাসিয়ান দিনে ধীরে ধীরে জমতে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যেই সেই অনিশ্চয়তা এত বেড়ে যায় যে, গ্রহটির চৌম্বকীয় অক্ষের নির্ভুল অবস্থান নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই সমস্যার সমাধানে, নতুন গবেষণার গবেষকরা ২০১১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে হাবল টেলিস্কোপের ছয়টি পর্যবেক্ষণ সেট ব্যবহার করে ইউরেনাসের চৌম্বক মেরুতে থাকা অরোরার গতিবিধি ট্র্যাক করেন। এর মাধ্যমে তারা গ্রহটির চৌম্বক মেরুর অবস্থান আরও নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হন এবং সেখান থেকে ইউরেনাসের ঘূর্ণনকাল আরও নির্ভুলভাবে হিসাব করতে পারেন। গবেষণা দলের মতে, নতুন এই পরিমাপের অনিশ্চয়তা মাত্র ০.০৪ সেকেন্ডেরও কম।

এই ২৮ সেকেন্ডের পার্থক্য ভয়েজার ২-এর অনুমানের ভুল সীমার মধ্যেই পড়ে, তবে নতুন হিসাবটি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

গবেষক দলের মতে, এই কম অনিশ্চয়তাসম্পন্ন নতুন স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আগামী কয়েক দশক পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ভবিষ্যতের ইউরেনাস মিশন (যেমন প্রস্তাবিত Uranus Orbiter and Probe) এই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের স্থান নির্ধারণ করতে পারবে।

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41550-025-02492-z

লেখক: সাদিয়া ইসলাম বর্ষা

বাংলাদেশ

নাসার আর্টেমিস চুক্তিতে বাংলাদেশের

বাংলাদেশ মহাকাশ অন্বেষণে শান্তিপূর্ণ ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের অঙ্গীকার করে নাসার আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে ৫৪তম দেশ হিসেবে স্বাক্ষর করেছে। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নাসা ও আন্তর্জাতিক মহাকাশ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা আরও জোরদার করবে।

রাজধানী ঢাকা শহরে মঙ্গলবার এক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ মহাকাশ অন্বেষণে নিরাপদ ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৫৪তম দেশ হিসেবে যুক্ত হলো। নাসা বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

“বাংলাদেশের স্বাক্ষর পেয়ে আমরা দারুণ উচ্ছ্বসিত,” বলেন নাসার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক জ্যানেট পেট্রো। “বাংলাদেশ মহাকাশ অনুসন্ধানের ভবিষ্যৎ গঠনে নিজের ভূমিকা নিশ্চিত করলো। এটি শুধুমাত্র চাঁদে যাত্রা নয়—বরং এর বাইরেও—শান্তিপূর্ণ, টেকসই ও স্বচ্ছ উপায়ে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়। আমরা একসঙ্গে কাজ করার, একে অপরের কাছ থেকে শেখার, এবং মহাকাশে মানবতার পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশের অসাধারণ প্রতিভা ও দূরদর্শিতা কীভাবে অবদান রাখে তা দেখার অপেক্ষায় আছি।”

বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিরক্ষা সচিব আশরাফ উদ্দিন এই অ্যাকর্ডসে স্বাক্ষর করেন। ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ারস ট্রেসি জ্যাকবসন অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং

জ্যানেট পেট্রো একটি পূর্বে রেকর্ড করা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেন।

NASA

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, "আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নাসা ও আন্তর্জাতিক মহাকাশ সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশের সম্পৃক্ততা আরও জোরদার করবে। এই অ্যাকর্ডে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ একটি উন্মুক্ত, দায়িত্বশীল ও শান্তিপূর্ণ মহাকাশ অন্বেষণের ভিত্তিকে আরও মজবুত করলো।"

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র, নাসা এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নেতৃত্বে সাতটি প্রাথমিক স্বাক্ষরকারী দেশ একত্র হয়ে আর্টেমিস অ্যাকর্ডস প্রতিষ্ঠা করে—যা ছিল মহাকাশ অন্বেষণে নিরাপত্তা বাড়াতে এবং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কমাতে প্রথম বাস্তবিক নির্দেশিকা। বর্তমানে এই অ্যাকর্ডসে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে।

"৫৪তম দেশ হিসেবে যুক্ত হলো বাংলাদেশ"

আর্টেমিস অ্যাকর্ডস আন্তর্জাতিক মহাকাশ চুক্তি এবং অন্যান্য চুক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেমন রেজিস্ট্রেশন কনভেনশন এবং রেসকিউ ও রিটার্ন অ্যাগ্রিমেন্ট। এছাড়াও নাসা ও তার অংশীদারদের সমর্থিত দায়িত্বশীল আচরণের সর্বোত্তম চর্চাগুলো, যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করাও রয়েছে, এতে অন্তর্ভুক্ত।

লেখক: ফাইজাহ্‌ সুলতানা

অণুজীববিজ্ঞান

মাটির গভীরে নতুন অজানা অণুজীব

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর গভীর মাটির স্তরে CSP1-3 নামে এক নতুন ও প্রভাবশালী অণুজীব ফাইলাম আবিষ্কার করেছেন, যা পানির দূষণ অপসারণে সাহায্য করে। এই অণুজীবেরা বহু বছর ধরে অভিযোজনের মাধ্যমে পুষ্টিহীন পরিবেশে সক্রিয়ভাবে বেঁচে আছে।

Michigan State University

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর "ক্রিটিক্যাল জোন"-এর গভীর মাটির স্তরে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অণুজীবের পর্ব (Phylum) আবিষ্কার করেছেন। এই অঞ্চলটি মাটির এমন এক গভীর স্তর, যা পানির গুণগত মান পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভূগর্ভস্থ পানি, যেটি পরবর্তীতে পানযোগ্য পানিতে রূপান্তরিত হয়, এই অণুজীবদের বাসস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তারা সেই পানিতে থাকা দূষণকারী উপাদানগুলো ভক্ষণ করে পরিষ্কার করে। এ সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি *Proceedings of the National Academy of Sciences* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্রশিল্পী ও বিজ্ঞানী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একবার বলেছিলেন, "আমরা আকাশের নক্ষত্রদের চলাচল সম্পর্কে যতটা জানি, তার চেয়ে মাটির নিচে কী আছে, তা কম জানি।" মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির জীবাণুবিজ্ঞানী জেমস টাইডজি এই কথার সঙ্গে একমত। তবে তিনি এই সীমাবদ্ধতা দূর করার লক্ষ্যেই কাজ করছেন, বিশেষ করে পৃথিবীর "ক্রিটিক্যাল জোন" নিয়ে, যেটিকে তিনি পৃথিবীর "জীবন্ত চামড়া"র অংশ হিসেবে বর্ণনা করেন।

"ক্রিটিক্যাল জোন গাছের চূড়া থেকে শুরু করে মাটির প্রায় ৭০০ ফুট গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত," বলেন টাইডজি। "এই অঞ্চল পৃথিবীর অধিকাংশ জীবনের সহায়ক, কারণ এটি মাটি গঠন, পানি ও পুষ্টি উপাদানের চক্র নিয়ন্ত্রণ করে—যা খাদ্য উৎপাদন, পানির মান ও বাস্তুসংস্থানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর গভীর অংশটি এখনও অনেকটাই অনাবিষ্কৃত।"

গভীর মাটির স্তরে কী পেলেন গবেষকেরা?

গবেষকরা এক বিশাল, অজানা অণুজীবীয় জগতে একটি সম্পূর্ণ নতুন ফাইলাম শনাক্ত করেছেন, যার নাম CSP1-3।

এই নতুন ফাইলামটি আইওয়া ও চীনের মাটির ৭০ ফুট গভীর থেকে সংগৃহীত নমুনায় পাওয়া গেছে। কেন এই দুটি অঞ্চল? কারণ এই দুই জায়গার মাটির গঠন তুলনায়মূলক বেশ গভীর এবং দেখতে সিমিলার, এবং গবেষকেরা জানতে চেয়েছিলেন এই অণুজীব শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নাকি আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে আছে।

গভীর মাটি থেকে পাওয়া এই অনুজীবদের DNA বিশ্লেষণে দেখা গেছে CSP1-3 এর পূর্বপুরুষরা বহু মিলিয়ন বছর আগে গরম প্রস্রবণ ও মিঠা পানির পরিবেশে বসবাস করত। পরে তারা অন্তত একবার পরিবেশ বদল করে প্রথমে উপরিভাগের মাটিতে এবং পরে ক্রমে গভীর মাটিতে বসতি গড়ে তোলে।

টাইডজি আরও বলেন, এই অণুজীবগুলো আসলে সক্রিয়। অনেকেই ভাবতে পারেন এরা নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় স্পোরের মতো। কিন্তু আমরা DNA বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এরা ধীরে হলেও সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আরও চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, এরা মাটির নিচে বেশ প্রভাবশালী। কিছু ক্ষেত্রে তারা মাটির জৈব সমাজের ৫০% বা তার বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে, যা উপরিভাগের মাটিতে কখনও দেখা যায় না।

এই অণুজীব কীভাবে পানি পরিশোধন করে?

মাটি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক পানি পরিশোধক। যখন পানি মাটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন ফিজিক্যাল, রাসায়নিক ও জীববৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তা পরিষ্কার হয়। উপরিভাগের মাটি, যেখানে গাছের মূল থাকে, তার ভলিউম কম এবং বৃষ্টির পানি দ্রুত তা অতিক্রম করে যায়। কিন্তু গভীর মাটির পরিমাণ বেশি, এবং এখানেই CSP1-3 কাজ করে। উপরিভাগ থেকে নেমে আসা কার্বন ও নাইট্রোজেন ব্যবহার করে তারা পানিকে আরও বিশুদ্ধ করে তোলে।

এরপর কী?

গবেষকরা এসব অণুজীবকে ল্যাবরেটরিতে চাষ করতে চান। যদি তা সম্ভব হয়, তবে তাদের অদ্বিতীয় শারীরবৃত্তীয় গঠন সম্পর্কে আরও জানা যাবে, যা তাদের এই চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে। তবে এটি মোটেই সহজ কাজ নয়। অধিকাংশ অণুজীব চাষযোগ্য নয়, কারণ তাদের বাসস্থান অনুকরণ করা কঠিন।

উদাহরণ হিসেবে, CSP1-3 এর পূর্বপুরুষরা যেহেতু গরম প্রস্রবণে বাস করত, তাই টাইডজির ল্যাব চেষ্টা করছে বেশি তাপমাত্রায় তাদের চাষ করতে।

CSP1-3-এর শারীরবৃত্তীয় গঠন ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া একেবারে আলাদা। তাই তাদের মধ্যে এমন কিছু জিন থাকতে পারে যেগুলো আমাদের জন্য অন্যভাবে উপযোগী হতে পারে। যেমন, তারা হয়তো কঠিন দূষণকারী পদার্থ ভাঙতে সক্ষম। যদি সেটা জানা যায়, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পরিবেশগত সমস্যাগুলোর একটি সমাধানে এগিয়ে যেতে পারব।

রেফারেন্স: DOI: 10.1073/pnas.2424463122
লেখক: ইসরাত জাহান

জেনেটিক্স

ছয় প্রজাতির নরবানরের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স

বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো ছয়টি নরবানর প্রজাতির সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্স করতে সক্ষম হয়েছেন, যা মানুষ ও বানরের জিনগত পার্থক্য বোঝা এবং বিপন্ন প্রজাতিগুলোর সংরক্ষণে নতুন সুযোগ এনে দেবে। এই গবেষণায় নতুন জিন ও অজানা ডিএনএ গঠনও আবিষ্কৃত হয়েছে।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গবেষণার পর, বিজ্ঞানীরা জেনেটিকস গবেষণায় এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছেন: তারা সফলভাবে ছয়টি এইপ (ape) বা নরবানর প্রজাতির সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্স করেছেন—যা কিছু বছর আগেও অকল্পনীয় ছিল।

এই গবেষণার ফলাফল গত ৯ এপ্রিল, ২০২৫ এ *Nature* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১২৩ জন গবেষক অংশ নিয়েছেন। এই সাফল্য বানর সংরক্ষণে সহায়ক হবে এবং মানুষ ও অন্যান্য বানরের মধ্যকার জিনগত পার্থক্য বোঝার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই গবেষনার ক্যাটেরিনা মাকোভা বলেন "আমি কখনও ভাবিনি, আমার জীবদ্দশায় এটি সম্ভব হবে।" উল্লেখ্য, তিনি প্রায় ২৫ বছর ধরে বানরের সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য কাজ করে আসছেন।

জিনোম হলো একটি কোষে থাকা ডিএনএ নির্দেশনার পূর্ণ সেট। সিকোয়েন্সিং মানে হলো, প্রতিটি ডিএনএ অণুর উপাদানগুলোর পরিচয় ও তাদের ক্রম নির্ধারণ করা। ২০০১ সালে মানুষের জিনোম সিকোয়েন্স সম্পন্ন হওয়ার পর, বিজ্ঞানীরা অন্যান্য বানরের জিনোম নিয়েও কাজ শুরু করেন—কারণ এরা মানবজাতির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ জিনগত আত্মীয়।

"২০০১ সালে মানুষের জিনোম সিকোয়েন্স সম্পন্ন হয়"

"'নন-হিউম্যান' বানরদের জিনোম বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা মানুষ কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং আমাদের মধ্যে কোন জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য বানরদের থেকে আলাদা করেছে তা জানতে সহায়তা করে", বলেন মাকোভা।

পূর্বে বিজ্ঞানীরা কিছু বানর প্রজাতির আংশিক জিনোম সিকোয়েন্স করতে পেরেছিলেন, তবে কোনও একটি প্রজাতির সম্পূর্ণ জিনোম কখনও সম্পূর্ণরূপে সিকোয়েন্স করা যায়নি। কিন্তু এই গবেষণায় মাকোভা ও তার দল উন্নত সিকোয়েন্সিং প্রযুক্তি ও অ্যালগরিদম ব্যবহার করেছেন, যার মাধ্যমে তারা ডিএনএ-র দীর্ঘ অংশ পড়তে এবং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম সিকোয়েন্স করতে পেরেছেন—কোনও ফাঁক না রেখেই। যা আগে কখনও সম্ভব হয়নি।

Fiona Rogers/Nature Picture Library

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে গবেষকরা ছয়টি বানর প্রজাতির জিনোম উন্মোচন করেছেন: শিম্পাঞ্জি, বনোবো, গরিলা, বোর্নিওর ওরাংওটাং, সুমাত্রার ওরাংওটাং এবং সিয়ামাং গিবন। তারা প্রতিটি প্রজাতিতে ৭৭০ থেকে ১,৪৮২টি সম্ভাব্য নতুন জিন খুঁজে পেয়েছেন। এছাড়াও, জিনোমের আগে পৌঁছাতে না পারা অংশে অদ্ভুত ডিএনএ গঠনও আবিষ্কৃত হয়েছে।

গবেষক লিলিয়ানা কোর্টেস অর্টিজ বলেন, "এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। তিনি আরো বলেন, সম্পূর্ণ জিনোম গবেষণায় আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ সম্ভব হবে, যা বিভিন্ন প্রাইমেট লাইনেজের বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়াবে।

বিশেষ করে বিপন্ন বানর প্রজাতিগুলোর জিনগত বৈচিত্র্য বিশ্লেষণে এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে; এই ছয়টি প্রজাতিই বর্তমানে বিপন্ন বা অতি বিপন্ন তালিকাভুক্ত। ভবিষ্যতে এই জিনোম সিকোয়েন্স বিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে পারে সেসব বানর জনগোষ্ঠী সনাক্ত করতে, যাদের মাঝে কিছু অপরিহার্য জিন আছে—যা সংরক্ষণ না করলে প্রজাতির টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। মাকোভা ও তার সহকর্মীদের সংগৃহীত এই তথ্য বিশ্বের যেকোনো বিজ্ঞানীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে । (https://github.com/marbl/Primates)

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41586-025-08816-3

লেখক: ইসরাত জাহান

ডোপামিন

ডোপামিন হলো মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বার্তাবাহক। এটি আমাদের শেখার ক্ষমতা, মনোযোগ ধরে রাখা এবং লক্ষ্য অর্জনের প্রেরণা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অনেকেই ডোপামিনকে "সুখের হরমোন" বলে ভাবেন, কিন্তু আসলে ডোপামিন সরাসরি সুখের অনুভূতির জন্য দায়ী নয়। একে বরং এমন একটি রাসায়নিক হিসেবে ভাবা ভালো যা আমাদের সেই সুখ বা সন্তুষ্টির অনুভূতি অর্জনের পথে ঠেলে দেয়। ধরুন, আপনি যখন কোনো প্রিয় কাজ করছেন (প্রিয় বই পড়ছেন বা প্রিয় খাবার খাচ্ছেন) তখন আপনার মস্তিষ্ক ডোপামিন নিঃসরণ করে। এর ফলে আপনি সেই কাজটি চালিয়ে যেতে আরও উৎসাহিত হন। ডোপামিন আমাদের মনোযোগকে বর্তমান কাজে কেন্দ্রীভূত করে এবং পরিকল্পনাগুলোকে সুসংগঠিত করতে সাহায্য করে। এমনকি কোনো কাজ শেষ করতে হলে কী কী ধাপ নিতে হবে, তা পরিকল্পনা করতেও এ রাসায়নিক ভূমিকা রাখে।

nopparit/Getty Images

ডোপামিন এক ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার, যার কাজ এক স্নায়ুকোষ (নিউরন) থেকে আরেক স্নায়ুকোষে সংকেত পাঠানো। নিউরনগুলোর মাঝের ফাঁক বা সংযোগস্থলকে বলা হয় 'সিন্যাপস'। যখন কোনো সংকেত প্রেরণের প্রয়োজন হয়, তখন ডোপামিন সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে পার হয়ে পরবর্তী নিউরনকে উদ্দীপ্ত করে। এই সংবেদনশীল প্রক্রিয়াই মস্তিষ্কের চিন্তা, আবেগ এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি।

বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, কিছু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সঙ্গে ডোপামিনের ঘাটতির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) তার একটি উদাহরণ। এই রোগে আক্রান্তদের মস্তিষ্কে কম মাত্রায় ডোপামিন নিঃসৃত হয়। ফলে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে এবং অস্থিরতা তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ওষুধের মাধ্যমে ডোপামিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হয়। তবে ডোপামিন বাড়ানোর ওষুধ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, কারণ অতিরিক্ত ডোপামিন মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে, যা নতুন সমস্যার জন্ম দিতে পারে।

অনুরূপভাবে, হেরোইন বা কোকেনের মতো অবৈধ মাদক দ্রব্য মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক হারে ডোপামিন নিঃসরণ ঘটায়। এ ছাড়াও জাঙ্ক ফুড খাওয়া, অতিরিক্ত ভিডিও গেম খেলা বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মতো কিছু কর্মকাণ্ডও স্বল্পমেয়াদে অতিরিক্ত ডোপামিন ছাড়াতে পারে। এধরনের অতি উত্তেজনা মস্তিষ্কে একধরনের "ইনস্ট্যান্ট রিওয়ার্ড" চক্র তৈরি করে, যা ধীরে ধীরে আসক্তির দিকে ঠেলে দেয়। তখন ব্যক্তি বাস্তব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও সম্পর্ককে অবহেলা করে কেবলমাত্র 'ডোপামিন বুস্ট'-এর জন্য নির্দিষ্ট কাজের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে।

"নিউরোট্রান্সমিটারের কাজ হলো এক স্নায়ুকোষ থেকে আরেক স্নায়ুকোষে সংকেত পাঠানো"

ডোপামিন শুধু আমাদের মানসিক উদ্দীপনাই নয়, শারীরিক চলাচলের জন্যও অত্যন্ত জরুরি। পেশির সুষ্ঠু সমন্বয় এবং চলাচলের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে ডোপামিন ভূমিকা রাখে। তাই ডোপামিনের ঘাটতির ফলে দেখা দিতে পারে নড়াচড়ার সমস্যা। যেমন পারকিনসন'স ডিজিস (পিডি)। পারকিনসন'স রোগ হলো এমন একটি স্নায়ু রোগ, যেখানে মস্তিষ্কের ডোপামিন উৎপাদনকারী কোষগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

এর ফলে রোগীরা ধীরে ধীরে হাত কাঁপুনি, হাঁটার সমস্যা এবং পেশি শক্ত হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গে ভোগেন। বিজ্ঞানীরা এখন ডোপামিন সরবরাহ বাড়িয়ে কিংবা বিকল্প উপায়ে এ ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন।

ডোপামিন শুধু মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে না, বরং শরীরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হিসেবেও কাজ করে। এটি রক্ত প্রবাহে মিশে শরীরের নানা অঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ডোপামিন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, কিডনিতে লবণের ভারসাম্য রক্ষা, এমনকি হজম প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক কাজেও জড়িত।

ডোপামিন এমন এক অনন্য রাসায়নিক, যা আমাদের চিন্তা, আবেগ, চলাফেরা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের সাথে গভীরভাবে জড়িত। এটি কখনো আমাদের সাফল্যের পথে চালিত করে, আবার কখনো এর অতিরিক্ততা আমাদের পতনের কারণ হতে পারে। ডোপামিনের কার্যকারিতা বোঝা এবং এর ভারসাম্য রক্ষা করা তাই সুখী ও সুস্থ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি।

মজার বিষয় হলো, মিউজিক মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসরণ বাড়িয়ে সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলতে পারে।

লেখক: আমিনা আখতার স্মৃতি

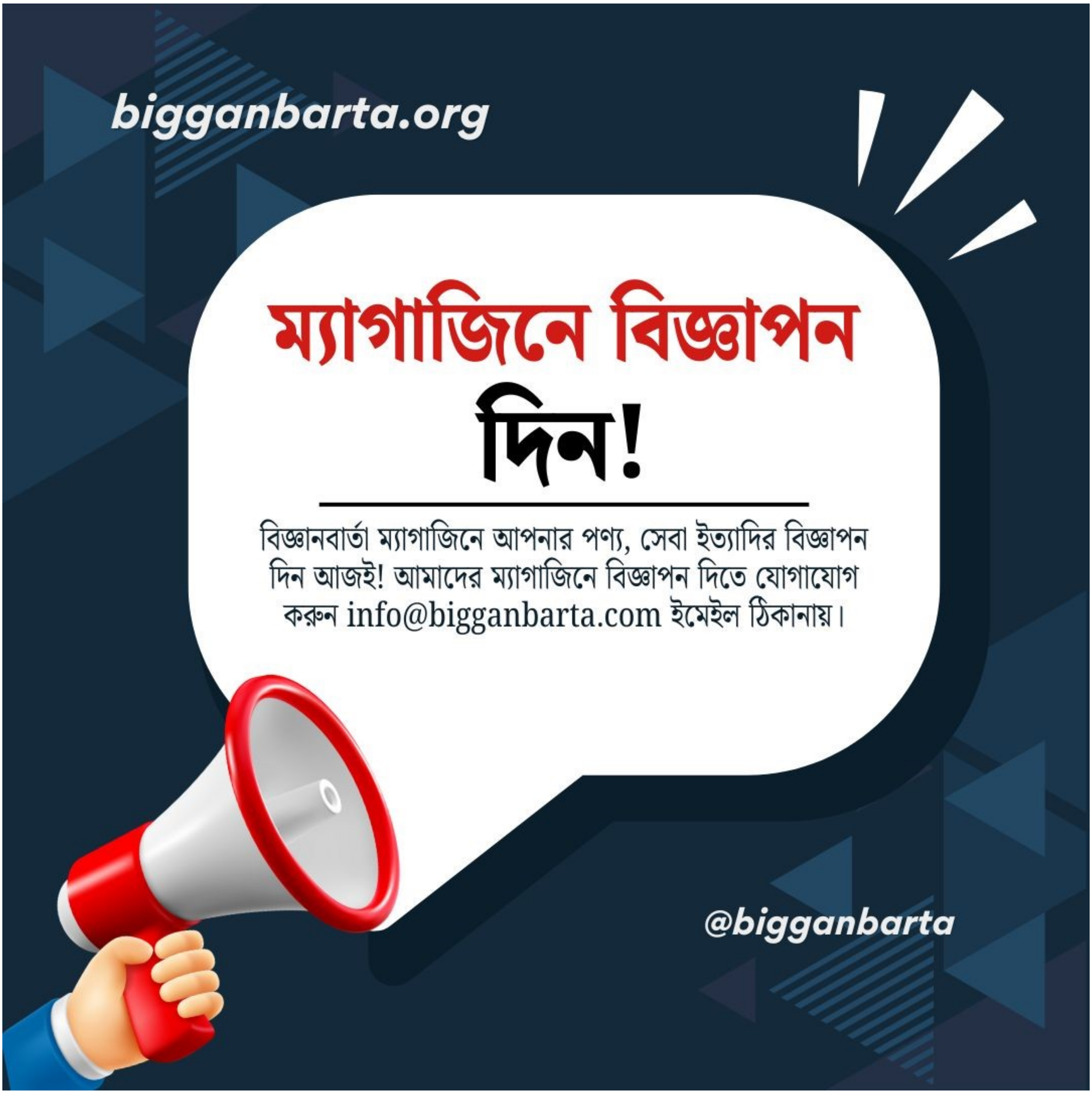

জ্যোতির্বিজ্ঞান

মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্ল্যাকহোল?

ফিনিক্স এ (Phoenix A*) আল্ট্রা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল, ফিনিক্স ক্লাস্টারের কেন্দ্রে অবস্থিত, যার ভর সূর্যের তুলনায় আনুমানিক ১০০ বিলিয়ন গুণ এবং ব্যাস প্রায় ৫৯০ বিলিয়ন কিলোমিটার। তবে এর ভর ও আকার নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, এবং এটি বর্তমান প্রযুক্তির পর্যবেক্ষণ সীমার বাইরে।*

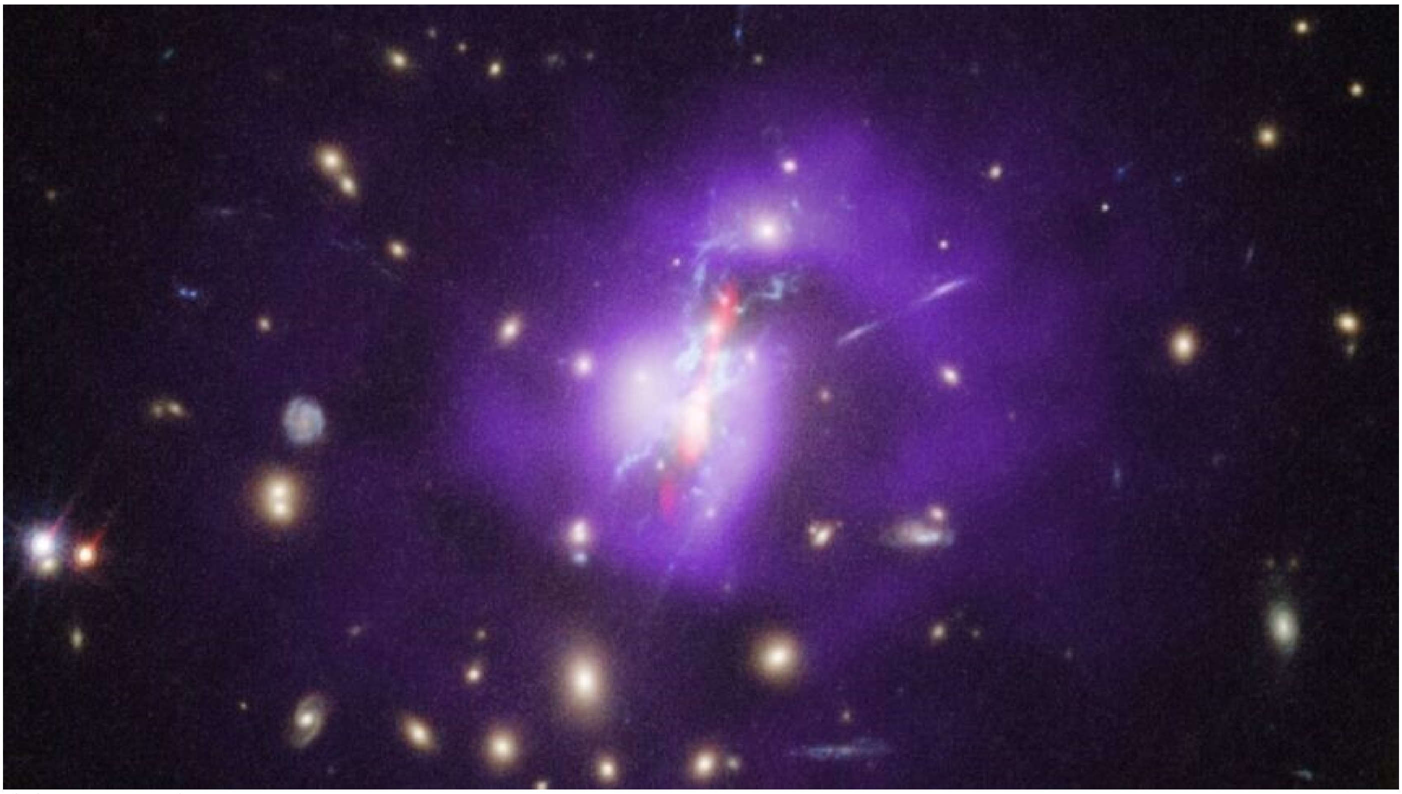

ফিনিক্স ক্লাস্টারের ছবি [NASA/CXC/NRAO/ESA/Michael McDonald (MIT)/Joseph DePasquale (STScI)]

আমাদের অতি চিরচেনা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল হচ্ছে সাগিটেরিয়াস-এ* (Sagittarius A*) ব্ল্যাক হোল। বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী, যার ভর অবিশ্বাস্যভাবে সূর্যের তুলনায় আনুমানিক ৪২,৯৭,০০০ গুণ বেশি হতে পারে। তবে এটি মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিশাল আকারের এবং অতি ভরসম্পন্ন একমাত্র ব্ল্যাকহোল নয়। এর অপেক্ষা কয়েক হাজার গুণ অধিক ভরসম্পন্ন এবং ধ্বংসাত্মক ব্ল্যাকহোল হয়তো লুকিয়ে রয়েছে এই সুবিশাল মহাবিশ্বে।

তবে বিজ্ঞানীরা অতি সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চ প্রযুক্তির ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ (ইএইচটি) স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী আল্ট্রা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব শনাক্ত করেছেন। যার অবিশ্বাস্য আকার ও ভর মহাকাশ বিজ্ঞান এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ফিনিক্স-এ* আল্ট্রা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল। তাদের অনুমান মতে, এর ভর হতে পারে আমাদের সূর্যের তুলনায় আনুমানিক ১০,০০০,০০০,০০০ গুণ (১০০ বিলিয়ন) বেশি।

ফিনিক্স এ* (Phoenix A*) আল্ট্রা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল বর্তমানে আমাদের সোলার সিস্টেম থেকে ৫.৮ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে ফিনিক্স ক্লাস্টার গ্রুপের ফিনিক্স (Phoenix A) তে অবস্থান করছে এবং এর ব্যাস বা ডায়ামিটার হতে পারে আনুমানিক ৫৯০ বিলিয়ন কিলোমিটার। মূলত ফিনিক্স ক্লাস্টার গ্রুপের কেন্দ্রীয় গ্যালাক্সি হল ফিনিক্স এ। এটা একটি উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি যার কেন্দ্রে একটি আল্ট্রা সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল "ফিনিক্স-এ*" থাকতে পারে।

আসলে ফিনিক্স ক্লাস্টার (SPT-CL J2344-4243) হল একটি বিশাল আকারের এবং আবেল ক্লাস টাইপ I গ্যালাক্সি

ক্লাস্টার যা ফিনিক্সের দক্ষিণ নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত । এটি প্রাথমিকভাবে গত ২০১০ সালে সাউথ পোল টেলিস্কোপ (South Pole Telescope)-এর সহযোগিতায় সুনিয়েভ-জেলডোভিচ ইফেক্ট (SZ effect) ব্যবহার করে দক্ষিণ আকাশে শনাক্ত করা হয়। এটি মহাবিশ্বে পরিচিত সবচেয়ে বৃহৎ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারগুলির মধ্যে একটি।

এটি এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে উজ্জ্বল এক্স-রে ক্লাস্টার, যা অন্য যে কোনো পরিচিত বৃহৎ ক্লাস্টারের চেয়ে বেশি এক্স-রে উৎপন্ন করে। এটি পৃথিবী থেকে ৮.৬১ বিলিয়ন আলোকবর্ষ (২.৬৪ গিগাপারসেক) দূরত্বে অবস্থিত। এতে প্রায় ৪২টি লোকাল গ্যালাক্সি চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও ফনিক্স-এ ক্লাস্টারে আনুমানিক ১ হাজারের অধিক গ্যালাক্সি থাকতে পারে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা।

এখানে উল্লেখ্য যে, ফনিক্স-এ* আল্ট্রা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিজ্ঞানীদের একটি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণামূলক প্রেডিকশন মাত্র। তাছাড়া এই তথ্য মহাকাশ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে কিছুটা বিভ্রান্তিকর এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক ডেটার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশেষ করে বর্তমানে পরিচিত সবচেয়ে ভর সম্পন্ন সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল টিওএন-৬১৮ আনুমানিক ৬৬ বিলিয়ন সৌর ভরের সমান এবং এবেল ১২০১ এর কেন্দ্রে থাকা ব্ল্যাকহোলের ভর আনুমানিক ৪০ বিলিয়ন সৌর ভরের সমান হতে পারে।

এদিকে, ফিনিক্স ক্লাস্টারে অবস্থিত ব্ল্যাকহোলের ভর বিজ্ঞানীদের পূর্ববর্তী গবেষণায় প্রায় ২০ বিলিয়ন সৌর ভর হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছিল। তবে অতি সাম্প্রতিক সময়ে ফিনিক্স-এ* ব্ল্যাকহোলের ১০০ বিলিয়ন সৌর ভরের দাবিটি কোনো স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশ করা হয়নি।

আসলে জোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী একটি ১০০ বিলিয়ন সৌর ভরের সমান ব্ল্যাকহোলের আনুমানিক আকার কিংবা বিস্তৃতি হতে পারে প্রায় ~২৯৫ বিলিয়ন কিলোমিটার বা ~০.০৩ আলোকবর্ষের সমান। এদিকে উল্লেখিত ফিনিক্সে ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রে এর আকার দেখানো হচ্ছে ৫৯০ বিলিয়ন কিলোমিটার। যা তাত্ত্বিক গবেষণার অনুমিত প্রেডিকশন অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি দেখানো হয়েছে।

“ফিনিক্স এ আল্ট্রা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের অবস্থান ৫.৮ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে ফিনিক্স ক্লাস্টারে এবং এর ব্যাস আনুমানিক ৫৯০ বিলিয়ন কিলোমিটার”*

নাসার ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ (EHT) এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের বর্তমানে প্রচলিত পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি দ্বারা আমাদের সোলার সিস্টেম থেকে অনেকটাই নিকটবর্তী ব্ল্যাকহোল (যেমন এম-৮৭* বা সাগিটেরিয়াস-এ*) পর্যবেক্ষণে ব্যবহার উপযোগী করে ডিজাইন ও তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ফনিক্স ক্লাস্টারের দূরত্ব হতে পারে ~৫.৮ বিলিয়ন আলোকবর্ষ বা তার অধিক। যা নিশ্চয়ভাবেই নাসার ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার সীমার বাইরে থাকার কথা।

আর বর্তমানে প্রচলিত প্রযুক্তি দিয়ে ফিনিক্স এ* আল্ট্রা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের মতো অত্যন্ত দূরবর্তী ব্ল্যাকহোল পর্যবেক্ষণ এবং সঠিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে থেকে যাচ্ছে।

লেখক: সিরাজুর রহমান

পদার্থবিজ্ঞান

নিউট্রিনোর ভর ০.৪৫ ইলেক্ট্রনভোল্টের চেয়ে কম

ক্যাটরিন (KATRIN) প্রজেক্টের মাধ্যমে নিউট্রিনোর ভরের সর্বোচ্চ সীমা কমিয়ে ০.৪৫ eV নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগের চেয়ে প্রায় অর্ধেক। এই গবেষণা নিউট্রিনোর প্রকৃতি ও মহাবিশ্বে তার ভূমিকা বোঝার পথে বড় পদক্ষেপ।

নিউট্রিনোর ভর নির্ধারণের জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত প্রচেষ্টায় এই রহস্যময় কণার ভরের জন্য একটি নতুন আপার লিমিট নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি ০.৪৫ ইলেকট্রন ভোল্ট (eV)-এর বেশি নয় — যা একটি ইলেকট্রনের ভরের এক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগেরও কম, যেখানে ইলেকট্রনের ভর

হলো ৫১১,০০০ eV। গত ১০ এপ্রিল, ২০২৫ এ *Science* জার্নালে এই ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

আজ পর্যন্ত নিউট্রিনোই একমাত্র মৌলিক কণা যার ভর এখনও অজানা। এর ভর পরিমাপ করতে পারলে জানা যেতে পারে কণাটি কীভাবে ভর অর্জন করে — অন্যান্য ভারী কণার মতো হিগস বোসনের মাধ্যমে, নাকি এখনো অজানা অন্য কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, বলেন জার্মানির হাইডেলবার্গে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের পদার্থবিদ সুজানে মার্টেন্স। তিনি আরও বলেন, নিউট্রিনোর ভর জানা গেলে বিগ ব্যাং থেকে উৎপন্ন নিউট্রিনোগুলো কীভাবে গ্যালাক্সির গঠনকে প্রভাবিত করেছে, তা নিয়েও আলোকপাত করা সম্ভব হবে।

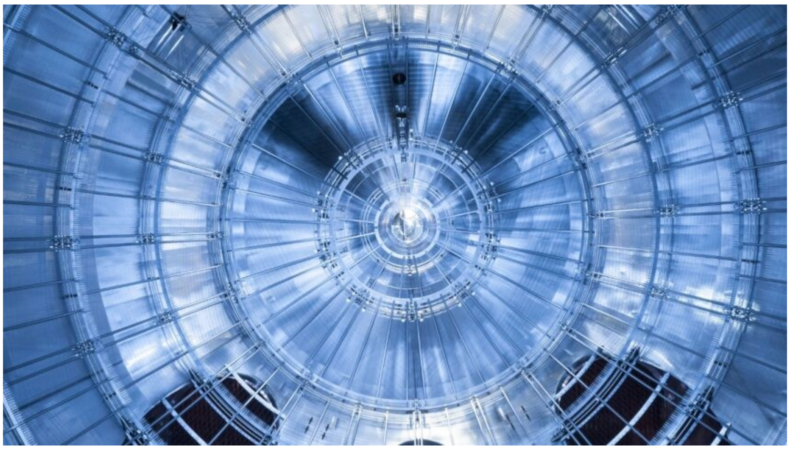

KATRIN এক্সপেরিমেন্ট থাকা প্রধান স্পেকট্রোমিটার (Markus Breig/KIT)

২০২২ সালে জার্মানির কার্লসরুয়ে ট্রিটিয়াম নিউট্রিনো (KATRIN) এক্সপেরিমেন্ট নিউট্রিনোর ভর সর্বোচ্চ ০.৮ eV বলে জানিয়েছিল। এবার মার্টেন্স ও তার সহকর্মীরা ২৫৯ দিনের তথ্য বিশ্লেষণ করে সেই হিসেব প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে এনেছেন।

KATRIN নিউট্রিনোকে পর্যবেক্ষণ করে ট্রিটিয়ামের রেডিওঅ্যাকটিভিটি বিশ্লেষণ করে — এটি হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ যার নিউক্লিয়াসে এক প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন থাকে। যখন ট্রিটিয়াম ক্ষয় হয়, তখন এটি একটি ইলেকট্রন এবং একটি অ্যান্টিনিউট্রিনো নির্গত করে; অ্যান্টিনিউট্রিনো হলো নিউট্রিনোর বিপরীত কণা এবং ধারণা করা হয় যে এর ভরও একই। অ্যান্টিনিউট্রিনো কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই পদার্থ ভেদ করে চলে যেতে পারে, ফলে সেগুলো হারিয়ে যায়। কিন্তু পরীক্ষাটিতে অবশিষ্ট ইলেকট্রনের শক্তির পরিসীমা পরিমাপ করা হয়। এদেরকে তখন ২৩ মিটার লম্বা, এয়ারশিপের মতো আকৃতির একটি ভ্যাকুয়াম-সিলড ডিটেক্টরের মধ্যে চালিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। কাগজে কলমে এটি সহজ শোনালেও বাস্তবে দলটিকে অনেক প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ পার হতে হয়েছে, বলেন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ লোরেদানা গাস্টালডো।

KATRIN এই বছরেই তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করবে। পুরো ১,০০০ দিনের তথ্য বিশ্লেষণ শেষ হলে গবেষকরা আশা করছেন নিউট্রিনোর সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ভরের সীমা ০.৩ eV বা সম্ভব হলে ০.২ eV পর্যন্ত নামিয়ে আনা যাবে। যদি কণাটির ভর ১ eV-এর কাছাকাছি হতো, তাহলে এমন একটি পরীক্ষা হয়তো প্রকৃত মানটি নির্ধারণ করতে পারত, বলেন কার্লসরুয়ে ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির পদার্থবিদ অ্যালেক্সেই লোখভ। তবে এখন আরও সংবেদনশীল পরীক্ষার প্রয়োজন — যার মধ্যে একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উন্নত সংস্করণ হলো KATRIN++।

রেফারেন্স: *DOI: [10.1126/science.adq9592](https://doi.org/10.1126/science.adq9592)*

লেখক: পুষ্পিতা আনোয়ার

জ্যোতির্বিজ্ঞান

ভিনগ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের জোরালো প্রমাণ

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের বাইরের সম্ভাব্য প্রাণের চিহ্নের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক সংকেত শনাক্ত করেছেন, যদিও তারা এখনো নিশ্চিত নন। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (JWST)-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বাধীন একদল জ্যোতির্বিদ K2-18b নামের এক্সোপ্ল্যানেটের বায়ুমণ্ডলে ডাইমিথাইল সালফাইড (DMS) এবং/অথবা ডাইমিথাইল ডিসালফাইড (DMDS)-এর রাসায়নিক চিহ্ন শনাক্ত করেছেন।

১৭ এপ্রিল, ২০২৫ এ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছিলেন যে, সৌরজগতের বাইরের একটি গ্রহে সম্ভাব্য প্রাণের উপস্থিতির সবচেয়ে আশা জাগানো "ইঙ্গিত" পাওয়া গেছে। তবে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই দাবির বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এই গ্রহটি হল K2-18b, যা লিও (Leo) নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত এবং পৃথিবী থেকে প্রায় ১২৪ আলোকবর্ষ দূরে। এটি নিয়ে বিজ্ঞান মহলে বেশ তর্ক-বিতর্ক চলছে—গ্রহটি কি পৃথিবী মতো কোনো মহাসাগরময় গ্রহ হতে পারে, যেখানে অণুজীবের বসবাস সম্ভব?

ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে দুটি রাসায়নিক উপাদানের চিহ্ন পেয়েছেন, যেগুলো বহুদিন ধরেই "বায়োসিগনেচার" বা প্রাণের সম্ভাব্য চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত।

পৃথিবীতে এই রাসায়নিক দুটি—ডাইমিথাইল সালফাইড (DMS) ও ডাইমিথাইল ডিসালফাইড—শুধুমাত্র জীবিত প্রাণ, বিশেষ করে সামুদ্রিক শৈবাল বা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের মাধ্যমেই তৈরি হয়। তবে গবেষকরা সতর্ক থেকে বলেছেন, আরও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে এবং এটি কোনো চূড়ান্ত আবিষ্কার নয়।

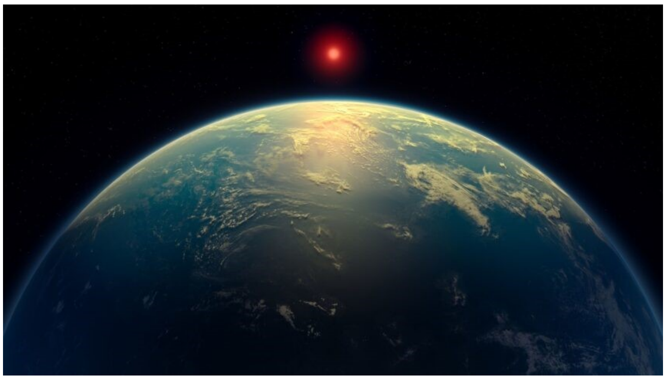

A. Smith, N. Madhusudhan (University of Cambridge)

ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক নিক্কু মাধুসূদন বলেন, "আমরা যা পাচ্ছি, তা হলো সৌরজগতের বাইরে প্রাণের সম্ভাব্য কার্যকলাপের ইঙ্গিত।" তিনি আরও বলেন, "সত্যি বলতে, এখন পর্যন্ত প্রাণের সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য দেখার সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছেছি আমরা।"

তবে অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা পূর্বের কিছু বিতর্কিত আবিষ্কারের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, এই রাসায়নিকগুলো অজানা, নন-বায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়ায়ও তৈরি হতে পারে।

রাসায়নিক ইঙ্গিত

K2-18b গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে ৮ গুণ বেশি ভর এবং আকারে ২.৫ গুণ বড়। এটি এমন এক "গোল্ডিলকস জোনে" রয়েছে, যেখানে তরল পানি থাকার সম্ভাবনা আছে—প্রাণের জন্য যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টেলিস্কোপের মাধ্যমে যখন কোনো গ্রহ তার নক্ষত্রের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তার বায়ুমণ্ডলে থাকা অণুগুলোর কারণে আলো কেমন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তা বিশ্লেষণ করে তথ্য পাওয়া যায়।

২০২৩ সালে, ওয়েব টেলিস্কোপ K2-18b-এর বায়ুমণ্ডলে মিথেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড শনাক্ত করে—এই প্রথম কোনো বাসযোগ্য অঞ্চলের গ্রহে এমন কার্বন-ভিত্তিক অণু পাওয়া যায়।

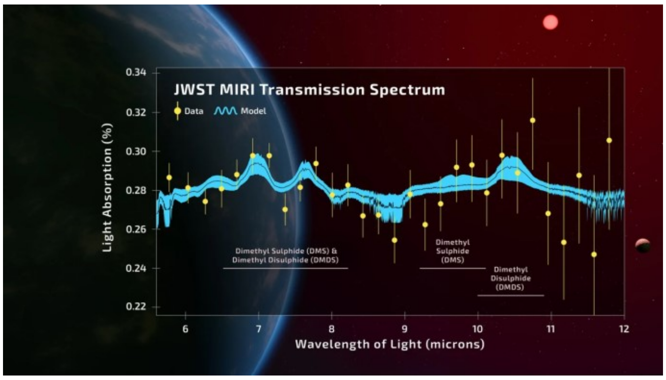

গ্রাফটি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের MIRI স্পেকট্রোগ্রাফ ব্যবহার করে K2-18b এক্সোপ্ল্যানেটের পর্যবেক্ষণ করা ট্রান্সমিশন স্ট্রকট্রাম [A. Smith, N. Madhusudhan (University of Cambridge)]

তখনই DMS-এর দুর্বল সংকেতও পাওয়া যায়, যার ভিত্তিতে এক বছর আগে ওয়েব টেলিস্কোপ আবার গ্রহটির দিকে নজর দেয়, এবার তার মিড-ইনফ্রারেড ইনস্ট্রুমেন্ট (MIRI) দিয়ে। এবার আরও শক্তিশালী সংকেত পাওয়া যায়, যদিও তা এখনও বিজ্ঞানীদের জন্য নির্ধারিত "ফাইভ সিগমা" মানদণ্ডে পৌঁছায়নি। ফলাফল যদি নিশ্চিতও হয়, তাও তা প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ নাও হতে পারে।

গত বছর বিজ্ঞানীরা একটি ধূমকেতুতে DMS-এর অস্তিত্ব পেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে ধারণা করা যায় যে এটি নন-বায়োলজিক্যালিও উৎপন্ন হতে পারে। তবে, K2-18b-এ পাওয়া রাসায়নিকটির ঘনত্ব পৃথিবীর তুলনায় হাজার গুণ বেশি, যা জৈব উৎসেরই ইঙ্গিত দেয় বলে মত দিয়েছেন মাধুসূদন।

আমরা কি মহাবিশ্বে একা?

K2-18b দীর্ঘদিন ধরেই “হাইসিয়ান গ্রহ” হিসেবে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচিত—যেখানে একটি বৃহৎ মহাসাগর রয়েছে এবং যা হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল দ্বারা আবৃত।

এমন গ্রহগুলোতে বুদ্ধিমান এলিয়েন প্রাণের সম্ভাবনা নেই বলেই ধরে নেওয়া হয়, তবে অণুজীব থাকতে পারে।

তবে কিছু গবেষণা বলছে, হাইসিয়ান গ্রহগুলো নক্ষত্রের এত কাছে থাকে যে সেখানে তরল পানি থাকার সম্ভাবনা কম। যেমন K2-18b, যা প্রতি ৩৩ দিনে তার নক্ষত্রকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রেমন্ড পিয়েরহামবার্ট বলেন, তার গবেষণা অনুযায়ী, K2-18b এতটাই গরম যে, যদি পানি থেকেও থাকে, তা হবে “নরকতুল্য গরম” ও বাসযোগ্যতার বাইরে। বরং সেখানে লাভার সাগর থাকার সম্ভাবনা বেশি।

এমআইটি-র অধ্যাপক সারা সিগার ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ অতীতে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের যে দাবি উঠেছিল, তা পরে ভিন্ন গ্যাস হিসেবে প্রমাণিত হয়। তিনি আরও বলেন, আমাদের সৌরজগতের মধ্যেই মঙ্গল, শুক্র বা শনি গ্রহের উপগ্রহ এনসেলাডাসের মতো জায়গায় প্রাণের সম্ভাবনা বেশি।

মাধুসূদন বলেন, তাদের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের মাত্র ১৬ থেকে ২৪ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন, যা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, K2-18b ছাড়াও ওয়েব ও ভবিষ্যতের টেলিস্কোপের মাধ্যমে পৃথিবীর বাইরের প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা এখন অনেক বেশি।

“এটি হতে পারে সেই টার্নিং পয়েন্ট মুহূর্ত, যখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি ‘আমরা কি মহাবিশ্বে একা?’—এবং তার উত্তর পাওয়ার কাছাকাছি চলে আসি।”

রেফারেন্স: DOI: 10.3847/2041-8213/adc1c8

লেখক: সাদিয়া ইসলাম বর্ষা

প্রত্নতত্ত্ব

বিড়ালের জটিল অরিজিন স্টোরি

গবেষণায় দেখা গেছে, গৃহপালিত বিড়ালের উৎপত্তি সম্ভবত উত্তর আফ্রিকার তিউনিশিয়ায়, যেখান থেকে তারা বিভিন্ন সময়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আগে ধারণা করা হতো বিড়াল নিওলিথিক যুগে ইউরোপে এসেছিল কৃষিতে ইঁদুর-কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের হাত ধরে, কিন্তু নতুন গবেষণা বলছে, ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক প্রভাব ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাদের বিস্তারের মূল চালিকা শক্তি।

গৃহপালিত বিড়াল হল ফেলিডি (Felidae) পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্যদের মধ্যে একটি। একটি পরিবার সিংহ, বাঘ, জাগুয়ার ও কাউগার অন্তর্ভুক্ত। বিড়ালই সেই পরিবারের একমাত্র সদস্য যাকে মানুষ গৃহপালিত করতে পেরেছে।

বিড়াল হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের সঙ্গে বসবাস করছে। ধারণা করা হয়, তারা সম্ভবত প্রথমে মানুষের শস্যভাণ্ডারের আশেপাশে ঘোরাফেরা শুরু করে। ইঁদুর ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ খেয়ে শস্যভাণ্ডার রক্ষায় সাহায্য করার পর এরা জাহাজে করে নাবিকদের সঙ্গে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

বিড়াল এখনও ইঁদুর নিয়ন্ত্রণে সাহায্যকরণেও মানুষকে সঙ্গী হিসাবে এখন বেশি জনপ্রিয়। বিগত কয়েক শতাব্দীতে মানুষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য কিছু বিড়াল প্রজাতিকে প্রজনন করিয়েছে। যার ফলে অনেকগুলো ভিন্ন বিড়ালের ব্রিড তৈরি হয়েছে।

গৃহপালিত বিড়ালের উৎপত্তি অনুসন্ধানকারী গবেষকেরা দীর্ঘদিন ধরেই মনে করতেন, বিড়ালরা সম্ভবত নবপ্রস্তরযুগে (১০,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে আনুমানিক ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

পর্যন্ত) কৃষকদের সঙ্গে ইউরোপে এসেছে কৃষিকাজের বিস্তারের সময়।

তবে দুটি নতুন বৃহৎ গবেষণা — একটি রোমের টর ভারগাটা বিশ্ববিদ্যালয় ও ৪২টি প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় এবং অন্যটি এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ৩৭টি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় — দেখিয়েছে যে এই ইতিহাসটি অনেক বেশি জটিল। উভয় গবেষণাই গৃহপালিত বিড়ালের সম্ভাব্য উৎপত্তিস্থল হিসেবে তিউনিশিয়াকে নির্দেশ করছে।

এই দুই গবেষণায় বিপুল পরিমাণ জেনেটিক তথ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ একত্রিত করে ইউরোপে গৃহপালিত বিড়ালের আগমনের সময়সীমাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং বিড়াল গৃহপালনে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাবের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

বিড়াল দীর্ঘদিন ধরে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এক ধাঁধা ছিল। তাদের কঙ্কাল কাঠামো ও সাধারণত ব্যবহৃত মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ মার্কার বন্য বিড়ালের সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়।

টর ভারগাটা বিশ্ববিদ্যালয়-নেতৃত্বাধীন দলটি ইউরোপ ও আনাতোলিয়ার ৯৭টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকে প্রাচীন বিড়ালের নমুনা, ইতালি, বুলগেরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন জাদুঘরের নমুনা বিশ্লেষণ করে প্যালিওজিনোমিক গবেষণা চালায়।

তাদের গবেষণা ২৯ মার্চ, ২০২৫ *bioRxiv* প্রিপ্রিন্ট সার্ভারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৭০টি লো-কভারেজ প্রাচীন জিনোম, ১৭টি জাদুঘরের জিনোম এবং ৩৭টি রেডিওকার্বন ডেটেড বিড়ালের দেহাবশেষ বিশ্লেষণ করা হয়।

পারমাণবিক ডিএনএ বিশ্লেষণের ফলাফলে দেখা যায়, ইউরোপে গৃহপালিত বিড়ালের পূর্বপুরুষদের উপস্থিতি প্রথম শতাব্দী খ্রিস্টাব্দের পর থেকে দেখা যায় — যা পূর্বের প্রচলিত ধারণার চেয়ে হাজারখানেক বছর পর।

এই গবেষণায় তারা দুটি আগমনের ঢেউ চিহ্নিত করেছে: প্রথম ঢেউয়ে খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে সার্ডিনিয়ায় বন্য বিড়াল আসে, যেখান থেকে আজকের বন্য বিড়াল জনসংখ্যার উৎপত্তি। দ্বিতীয় ঢেউটি আসে রোমান সাম্রাজ্যিক সময়ে, যখন আধুনিক গৃহপালিত বিড়ালের মতো জিনগত বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিড়াল ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে — এবং এর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তিউনিশিয়ার নাম উঠে আসে।

এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাটি ২২ এপ্রিল, ২০২৫ *bioRxiv*-এ প্রিপ্রিন্ট হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তারা ২০৬টি স্থানের ২,৪১৬টি প্রত্নতাত্ত্বিক বিড়ালের হাড় বিশ্লেষণ করে এবং জেনেটিক ফলাফলের সঙ্গে গঠনগত তথ্য মিলিয়ে দেখে, ইউরোপে গৃহপালিত বিড়াল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শুরুতেই এসে পৌঁছেছিল — রোমান সাম্রাজ্যের উত্থানের আগেই।

তাদের গবেষণায় ব্রিটেনে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়াল হ্যাপ্লোগ্রুপ পাওয়া গেছে, যা আয়রন যুগে বিড়ালের আগমনের ইঙ্গিত দেয়। এরপর রোমান, লেট অ্যান্টিক এবং ভাইকিং সময়ে একাধিক ঢেউয়ে বিড়াল ইউরোপে প্রবেশ করে। এই গবেষণাতেও তিউনিশিয়াকে গৃহপালিত বিড়ালের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আগের ধারণায় বিড়ালের গৃহপালন মূলত কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য বলে মনে করা হতো। কিন্তু এই গবেষণাগুলোতে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো গৃহপালনের গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে।

মিশরে বিড়ালদের দেবী বাসতেত-এর সঙ্গে পূজা করা হতো, যার ফলে বিড়াল মমি করার প্রথা এবং ধর্মীয় নেটওয়ার্কে তাদের স্থানান্তর ঘটেছে। গ্রিক-রোমান ধর্মাচারে বিড়াল দেবী আর্টেমিস ও ডায়ানার প্রতীক ছিল, যেটি মিশরের বাসতেত-এর গুরুত্বের প্রতিচ্ছবি। নর্স পুরাণেও দেবী ফ্রেয়্যার সঙ্গে বিড়ালের সংযোগ দেখা যায় — এই বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানগুলো বিড়ালের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

উভয় গবেষণায় গৃহপালিত বিড়াল এবং ইউরোপের দেশীয় বন্য বিড়ালের মধ্যে মিশ্রণ ও প্রতিযোগিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রথম সহস্রাব্দ খ্রিস্টাব্দ থেকে বন্য বিড়ালের সংখ্যায় ধীরে ধীরে পতনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় — সম্ভবত খাদ্য উৎসের জন্য প্রতিযোগিতা, রোগবালাই এবং আন্তঃপ্রজননের কারণে।

যদিও দুটি গবেষণায় গৃহপালিত বিড়ালের ইউরোপে আগমনের সময় ও পথ নিয়ে পার্থক্য আছে, তবে একটি ব্যাপারে উভয়ই একমত — ইউরোপে বিড়ালের গৃহপালন ও বিস্তার অনেক দেরিতে, এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল।

এই আবিষ্কার প্রাচীন নিওলিথিক বসতিতে বিড়ালের সর্বব্যাপী উপস্থিতির ধারণা ভেঙে দেয় এবং দেখায় যে শুধু মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ ব্যবহার করলে বিড়ালের গৃহপালনের পুরো চিত্র বোঝা যায় না।

সার্বিকভাবে, এই গবেষণাগুলো আমাদের অন্যতম পরিচিত সঙ্গী প্রাণী সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। প্রাচীন কৃষকদের পেছনে ছায়ার মতো হাঁটা প্রাণী নয়, বরং উত্তর আফ্রিকায় গৃহপালিত হওয়ার পর বহু ঢেউয়ে, মানব সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাস, বাণিজ্যিক পথ ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে বিড়াল ইউরোপে পৌঁছেছিল।

রেফারেন্স: *DOI: [10.1101/2025.03.28.645893](10.1101/2025.03.28.645893), [10.1101/2025.03.28.645877](10.1101/2025.03.28.645877)*

লেখক: ইসরাত জাহান

স্নায়ুবিজ্ঞান

চোখকে বোকা বানিয়ে নতুন রং তৈরি!

বিজ্ঞানীরা লেজার এবং বেশ কিছু উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের চোখে একেবারে নতুন একটি রঙ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, যা এর আগে কেউ দেখেনি। এই গবেষণা মানুষের রঙ দেখার সীমা প্রসারিত করতে পারে এবং ভবিষ্যতে বর্ণান্ধ চিকিৎসার জন্যও নতুন সম্ভাবনা খুলে দিতে পারে।

গবেষকরা লেজার ও ট্র্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের চোখের রেটিনায় নির্দিষ্ট কোষগুলিকে আলাদাভাবে সক্রিয় করে পাঁচজন মানুষের চোখে একেবারে নতুন একটি রঙ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন — যা এর আগে কোনো মানুষের চোখে দেখা যায়নি। এই নীল-সবুজ রঙটির উজ্জ্বলতা বা 'স্যাচুরেশন' এমন স্তরে পৌঁছেছে, যা মানুষের স্বাভাবিক রঙ দেখার সীমার বাইরে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইরভিন) রঙ-দর্শন বিজ্ঞানী কিম্বারলি জেমসন এই কাজটিকে "প্রযুক্তিগতভাবে অসাধারণ" এবং "একটি ব্যতিক্রমী অর্জন" বলে মন্তব্য করেছেন।

এটি প্রথমবার নয় যে গবেষকরা চোখের ফটোরিসেপ্টর কোষ (কোন কোষ) গুলিকে আলাদাভাবে উদ্দীপ্ত করেছেন। তবে এবার তারা চোখের এমন একটি বড় অংশে এটি করেছেন, যা দৃষ্টির ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। পর্তুগালের ব্রাগায় ইউনিভার্সিটি অব মিনহোর দৃষ্টিবিদ্যাবিশেষজ্ঞ সার্জিও ন্যাসিমেন্তো বলেন, "এই গবেষণায় নতুন বিষয় হলো, সত্যিই এমন নতুন রঙ মানুষের চোখে দেখা যেতে পারে — তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

স্যাচুরেশন লেভেল চার্টের বাইরে

গতকাল ১৮ এপ্রিল, ২০২৫-এ *Science Advances* জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এই নতুন রঙের নাম দিয়েছেন 'ওলো (olo)'। এটি কিছুটা ময়ূরের পালকের মতো নীল-সবুজ হলেও, তার উজ্জ্বলতা একেবারে প্রচলিত মাত্রার বাইরে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলির কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও দৃষ্টি গবেষক রেন এনজি, যিনি গবেষণার গবেষক এবং পরীক্ষার একজন অংশগ্রহণকারীও, বলেন, "এর স্যাচুরেশন লেভেল তো চার্টেই আসে না!"

এই প্রযুক্তির নাম দেওয়া হয়েছে 'Oz', এবং এটি 'Wizard' নামের একটি সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি রেটিনার প্রতিটি কোষে নিখুঁত পরিমাণে আলোর ডোজ পাঠিয়ে মস্তিষ্কের রঙ বোঝার প্রক্রিয়াকে ধোঁকা দেয় — এমনকি এমন সংকেতও সৃষ্টি করে যা আগে চোখ দেখা যায়নি।

এনজি বলেন, এই প্রযুক্তি দিয়ে আরও নতুন রঙ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। এমনকি যারা কালার ব্লাইন্ড, যাদের জন্য কার্যকর চিকিৎসা নেই, তারাও এর মাধ্যমে রঙের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হতে পারেন।

তবে, এটি বাস্তবায়নে অনেক কাজ বাকি। এখন পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে চোখের একেবারে ছোট একটি অংশে রঙ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এবং এই প্রযুক্তি খুব সীমিত আকারে শুধুমাত্র ল্যাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা না গেলেও, যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজ্যুয়াল নিউরোসায়েন্টিস্ট জেনি বোস্টেন বলেন, "এটি প্রযুক্তিগত দিক থেকে অত্যন্ত চমৎকার একটি অর্জন। ভবিষ্যৎ গবেষণার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।"

আলোর ফিঙ্গারপ্রিন্ট

মানুষের রঙ দেখার ক্ষমতা নির্ভর করে মস্তিষ্কে তিন ধরনের কন কোষ থেকে পাওয়া সংকেতের তুলনার ওপর। এস (S) কন নীল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে সবচেয়ে বেশি সাড়া দেয়, এম (M) কন সবুজ আলোতে, এবং এল (L) কন লাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বেশি সংবেদনশীল। এই তিন কনের নির্দিষ্ট মাত্রার সক্রিয়তাই একটি নির্দিষ্ট রঙের অনুভূতি তৈরি করে — অনেকটা আঙুলের ছাপ বা কো-অর্ডিনেটের মতো।

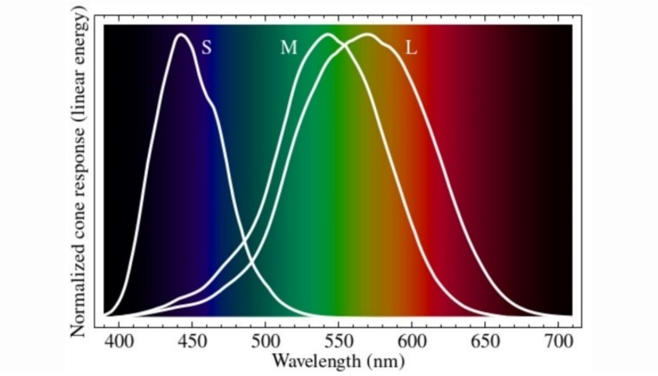

সাধারণ অবস্থায় এম কন সক্রিয় হলে এস ও এল কনও সক্রিয় হয়। কিন্তু নতুন গবেষণায় শুধুমাত্র এম কন আলাদাভাবে সক্রিয় করা হয়েছে (BenRG/Wikimedia Commons)

এম কন চোখের রঙ দর্শনের মাঝখানে থাকায়, একে সক্রিয় করলে সাধারণত এস ও এল কনও সক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু এনজি ও তার দল ভাবলেন, যদি শুধু এম কনকেই আলাদা করে উদ্দীপ্ত করা যায়, তাহলে কি নতুন কোনো রঙ সৃষ্টি হবে?

তারা প্রথমে প্রতি অংশগ্রহণকারীর রেটিনা স্ক্যান করে প্রতিটি কনের অবস্থান চিহ্নিত করেন। তারপর লেজার দিয়ে শুধুমাত্র এম কনগুলিকে আলতোভাবে উদ্দীপ্ত করেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বলা হয়, তারা যেটি দেখছেন, সেটির সঙ্গে একক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কোনো আলো মেলাতে। কিন্তু কোনো মিল পাওয়া যায়নি — ওলো (olo) রঙটি স্বাভাবিক দৃষ্টির সবচেয়ে উজ্জ্বল নীল-সবুজ রঙ থেকেও বেশি তীব্র। এনজি বলেন, অংশগ্রহণকারীদের এই ওলো রঙকে 'প্রাকৃতিক রঙে' নামিয়ে আনতে সাদা আলো মেশাতে হয়েছিল।

নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজ্যুয়াল নিউরোসায়েন্টিস্ট আনিয়া হার্লবার্ট বলেন, "এভাবে রেটিনাকে উদ্দীপ্ত করার ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।"

রঙের মায়া

Oz প্রযুক্তি শুধু একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করেই অংশগ্রহণকারীদের চোখে বিভিন্ন রঙ দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন কনকে বিভিন্ন মাত্রায় উদ্দীপ্ত করে এমন একটি সিগন্যাল তৈরি করা হয়েছে, যা মস্তিষ্ক সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট রঙ দেখলে রিঅ্যাক্ট করে। ফলে একটি লেজার দিয়েই পুরো রঙিন ভিডিও দেখানো সম্ভব হয়েছে।

গবেষকরা এখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বর্ণান্ধদের দৃষ্টি উন্নত করার চেষ্টা করছেন। সবচেয়ে প্রচলিত বর্ণান্ধদ মানুষের মাত্র দুটি কন ঠিকভাবে কাজ করে। স্পাইডার মানকির ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, জিন থেরাপি দিয়ে তৃতীয় কন যোগ করলে তারা পূর্ণ রঙদর্শন ক্ষমতা অর্জন করে। এনজি আশা করেন, লেজার দিয়ে নির্দিষ্ট কোষে আলো নিয়ন্ত্রণ করে কৃত্রিমভাবে তৃতীয় কন তৈরি করা যাবে। "তাহলে মস্তিষ্ক তিনটি চ্যানেলের তথ্য পাবে। প্রশ্ন হলো, তা দিয়ে কি মস্তিষ্ক পূর্ণ রঙ দেখতে পারবে?" — বলেন তিনি।

জেমসন বলেন, এই গবেষণা চোখ থেকে মস্তিষ্কে যাওয়া রঙের সংকেতের রহস্য উন্মোচনে সহায়তা করতে পারে এবং দেখার ক্ষমতা কতটা বাড়ানো সম্ভব — তা যাচাই করতে পারে। "এই প্রযুক্তি দিয়ে যেভাবে মানুষের দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা করা যাচ্ছে, তা অন্য কোনো মানবভিত্তিক টুলে সম্ভব হয়নি," — বলেন তিনি।

রেফারেন্স: *DOI: 10.1126/sciadv.adu1052*

লেখক: তাশফিয়া নুজহাত প্রজ্ঞা

সমুদ্র

ক্যামেরাবন্দি হলো জীবন্ত কোলোসাল স্কুইড

শ্মিট ওশান ইনস্টিটিউটের গবেষণা জাহাজ আর/ভি ফ্যালকর (টু)-তে থাকা সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানীদের একটি দল দক্ষিণ স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের কাছে পানিতে একটি জীবিত বাচ্চা কোলোসাল স্কুইড (Mesonychoteuthis hamiltoni) তার প্রকৃতিক পরিবেশে ভিডিওতে ধারণ করেছে।

Schmidt Ocean Institute

দক্ষিণ মহাসাগরের গভীর জলে প্রথমবারের মতো একটি কিশোর কোলোসাল স্কুইড (*Mesonychoteuthis hamiltoni*)-কে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্যামেরাবন্দি করেছে গবেষকরা। একটি বিরল এবং ঐতিহাসিক সাফল্য বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২০২৫ সালের ৯ মার্চ, গবেষণা জাহাজ R/V Falkor (too) থেকে পরিচালিত রিমোট অপারেটেড যান (ROV) SuBastian ৬০০ মিটার গভীরে একটি ৩০ সেমি লম্বা বাচ্চা কোলসাল স্কুইডের ভিডিও ধারণ করে। কোলোসাল স্কুইড, যাকে অ্যান্টার্কটিক ক্রাঞ্চ স্কুইড বা জায়ান্ট স্কুইড নামেও ডাকা হয়, গ্লাস স্কুইড পরিবারের (Cranchiidae) সদস্য এবং এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী অমেরুদণ্ডী প্রাণী। প্রাপ্তবয়স্ক স্কুইডগুলো ১০ থেকে ১৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এবং ওজন হতে পারে ৫০০ থেকে ৭০০ কেজি পর্যন্ত।

"প্রথমবারের মতো কোলসাল স্কুইডের ছোট্ট বাচ্চাকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখে আমরা রোমাঞ্চিত। ভাবতেই অবাক লাগে, ওরা জানেই না যে আমরা মানুষ নামে কোনো প্রাণী আছি," বলেন অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির গবেষক ড. ক্যাট বোলস্টাড। "গত ১০০ বছরে আমরা এদের শুধু তিমি ও সামুদ্রিক পাখিদের পেটে অবশিষ্টাংশ হিসেবে কিংবা দাঁতওয়ালা মাছের শিকারি হিসেবে চিনতাম।"

এর কিছুদিন আগেই, ২০২৫ সালের ২৫ জানুয়ারি, একই গবেষণা জাহাজ দক্ষিণ মহাসাগরে গ্লেশিয়াল গ্লাস স্কুইড (*Galiteuthis glacialis*)-এর প্রথম নিশ্চিত ভিডিও ধারণ করে—এটিও একটি গ্লাস স্কুইড প্রজাতি, যা আগে কখনো জীবিত অবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখা যায়নি।

"এর আগে কোলোসাল স্কুইড কখনো জীবিত অবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখা যায়নি"

"কোলসাল স্কুইডের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের আটটি বাহুর মাঝখানে হুক থাকে, যা দিয়ে আমরা সহজেই গ্লেশিয়াল গ্লাস স্কুইড থেকে তাদের আলাদা করতে পারি,"

বলেন গ্লাস স্কুইড পরিবারের বিশেষজ্ঞ ড. অ্যারন ইভানস। "তবে বাচ্চা কোলসাল স্কুইড আর গ্লেশিয়াল গ্লাস স্কুইড দেখতে অনেকটা একই রকম—দুজনেরই দেহ স্বচ্ছ এবং দীর্ঘ দুই শুঁড়ের শেষ প্রান্তে ধারালো হুক থাকে।"

জাহাজে না থেকেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জীববিজ্ঞানীরা রিয়েল টাইমে ভিডিও বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন টেলিপ্রেজেন্স প্রযুক্তির মাধ্যমে। "আমরা সমুদ্রে থাকলেও, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানীদের সহায়তা নিতে পারছি—এটা সত্যিই অসাধারণ," বলেন অভিযানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইউনিভার্সিটি অব এসেক্সের গবেষক ড. মিশেল টেইলর।

শ্মিট ওশান ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. জ্যোতিকা বীরমানি বলেন, "একই অভিযানে দুটি ভিন্ন স্কুইডের প্রথমবারের মতো দেখা পাওয়া অত্যন্ত চমকপ্রদ। এটা প্রমাণ করে, দক্ষিণ মহাসাগরের অসাধারণ প্রাণীগুলোর কতটুকুই বা আমরা এখনো দেখেছি।"

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/lzPoG9H8Hlo

এই নতুন আবিষ্কার আমাদের গভীর সমুদ্রের প্রাণীজগত এবং এর রহস্যময় বাসিন্দাদের সম্পর্কে জানার পথে একটি বড় অগ্রগতি।

লেখক: নোশীন নওর জামান

জ্যোতির্বিজ্ঞান

মেসিয়ার ৮৩ গ্যালাক্সিতে সক্রিয় সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল

ESA/Webb/NASA/CSA/A. Adamo (Stockholm University)/FEAST JWST team

স্পাইরাল গ্যালাক্সি মেসিয়ার ৮৩-এর কেন্দ্রে উচ্চমাত্রার আয়নিত নিয়ন গ্যাস শনাক্ত করেছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ, যা সক্রিয় গ্যালাকটিক নিউক্লিয়াস (AGN)-এর ইঙ্গিত দিতে পারে – বলছে স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইনস্টিটিউটের নেতৃত্বে একদল জ্যোতির্বিদ।

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ থেকে সংগ্রহ করা তথ্য বিশ্লেষণে ১৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে হাইড্রা নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থান করা বার্ড স্পাইরাল গ্যালাক্সি, মেসিয়ার ৮৩-এর কেন্দ্রে বহুদিন ধরে খোঁজা হয়ে আসা এক সক্রিয় গ্যালাকটিক নিউক্লিয়াসের (AGN) সম্ভাব্য লক্ষণ মিলেছে।

দক্ষিণ পিনহুইল গ্যালাক্সি নামেও পরিচিত Messier 83 (M83) গ্যালাক্সিটি রাত্রির আকাশে দৃশ্যমান সবচেয়ে উজ্জ্বল স্পাইরাল গ্যালাক্সিগুলোর একটি, যা বিশেষ করে মে মাসে দূরবীন বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুব সহজেই দেখা যায়। আকারে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির প্রায় অর্ধেক হলেও, এটি সেন্টরাস A/M83 গ্যালাক্সি গ্রুপের একটি গুরুত্বপূর্ণ

সদস্য। এই গ্রুপে রয়েছে ইরেগুলার গ্যালাক্সি NGC 5253 এবং ধুলোময় উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি সেন্টরাস A (NGC 5128)।

১৭৫২ সালে ফরাসি জ্যোতির্বিদ নিকোলাস লুই দ্য লাকেই M83 আবিষ্কার করেন। বহু বছর ধরে জ্যোতির্বিদরা এই বিশাল স্পাইরাল গ্যালাক্সিটিতে একটি কেন্দ্রস্থ সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের প্রমাণ খুঁজে ফিরেছেন, কিন্তু স্পষ্ট কোনও চিহ্ন মেলেনি।

তবে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের মিড-ইনফ্রারেড ইনস্ট্রুমেন্ট (MIRI) ব্যবহার করে ঘন আন্তঃনাক্ষত্রিক ধুলোর ভেতর দিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছে এবং গ্যালাক্সির কেন্দ্রে উচ্চমাত্রার আয়নিত নিয়নের বিকিরণ শনাক্ত করা গেছে।

“আমরা যখন M83-এর কেন্দ্রে এই উচ্চমাত্রার আয়নিত নিয়নের বিকিরণ দেখলাম, তখন সেটা আমাদের জন্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল,” বলেছেন স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইনস্টিটিউটের ড. স্বিয়া হের্নান্দেজ। “এ ধরনের বিকিরণ তৈরি করতে বিপুল পরিমাণ শক্তি দরকার – যা সাধারণ নক্ষত্রের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। এ থেকেই বোঝা যায়, M83-এ হয়তো একটি সক্রিয় গ্যালাকটিক নিউক্লিয়াস (AGN) আছে, যা এতদিন আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে।”

ড. লিন্ডা স্মিথ, যিনি একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, বললেন, “বছরের পর বছর ধরে জ্যোতির্বিদরা M83-তে একটি ব্ল্যাক হোলের খোঁজ করেও সফল হননি। এবার আমরা এমন এক তথ্য পেয়েছি, যা সেই সম্ভাবনাকে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।”

এই আয়নিত গ্যাস সৃষ্টির জন্য যে শক্তি দরকার, তা সাধারণ সুপারনোভা কিংবা পরিচিত নাক্ষত্রিক প্রক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর ফলে সবচেয়ে সম্ভাব্য উৎস হিসেবে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলকেই মনে করা হচ্ছে। তবে গবেষকরা এখনও বিকল্প ব্যাখ্যাগুলোকেও (যেমন এক্সট্রিম শক ওয়েভ) গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন।

এই আবিষ্কার গ্যালাক্সির কেন্দ্র নিয়ে গবেষণায় একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে এবং জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের অসাধারণ ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে।

“অনেক জ্যোতির্বিদ মনে করেছিলেন, M83-তে AGN থাকার সম্ভাবনা নাকচ হয়ে গেছে,” বললেন ড. স্মিথ। “কিন্তু এখন আমাদের হাতে এমন এক নতুন প্রমাণ আছে, যা সেই পুরনো ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং অনুসন্ধানের জন্য নতুন দরজা খুলে দিচ্ছে।”

গবেষণা চলতেই থাকবে, এবং M83-এর এতদিন গোপনে থাকা এই কেন্দ্র হয়তো শিগগিরই আমাদেরকে গ্যালাক্সির আচরণ এবং তাদের কেন্দ্রে থাকা সুপারম্যাসিভ রহস্যগুলো নিয়ে আরও গভীর ধারণা দেবে।

রেফারেন্স: DOI: 10.3847/1538-4357/adba5d

লেখক: ইরতা আমালিয়া

ভিনগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব?

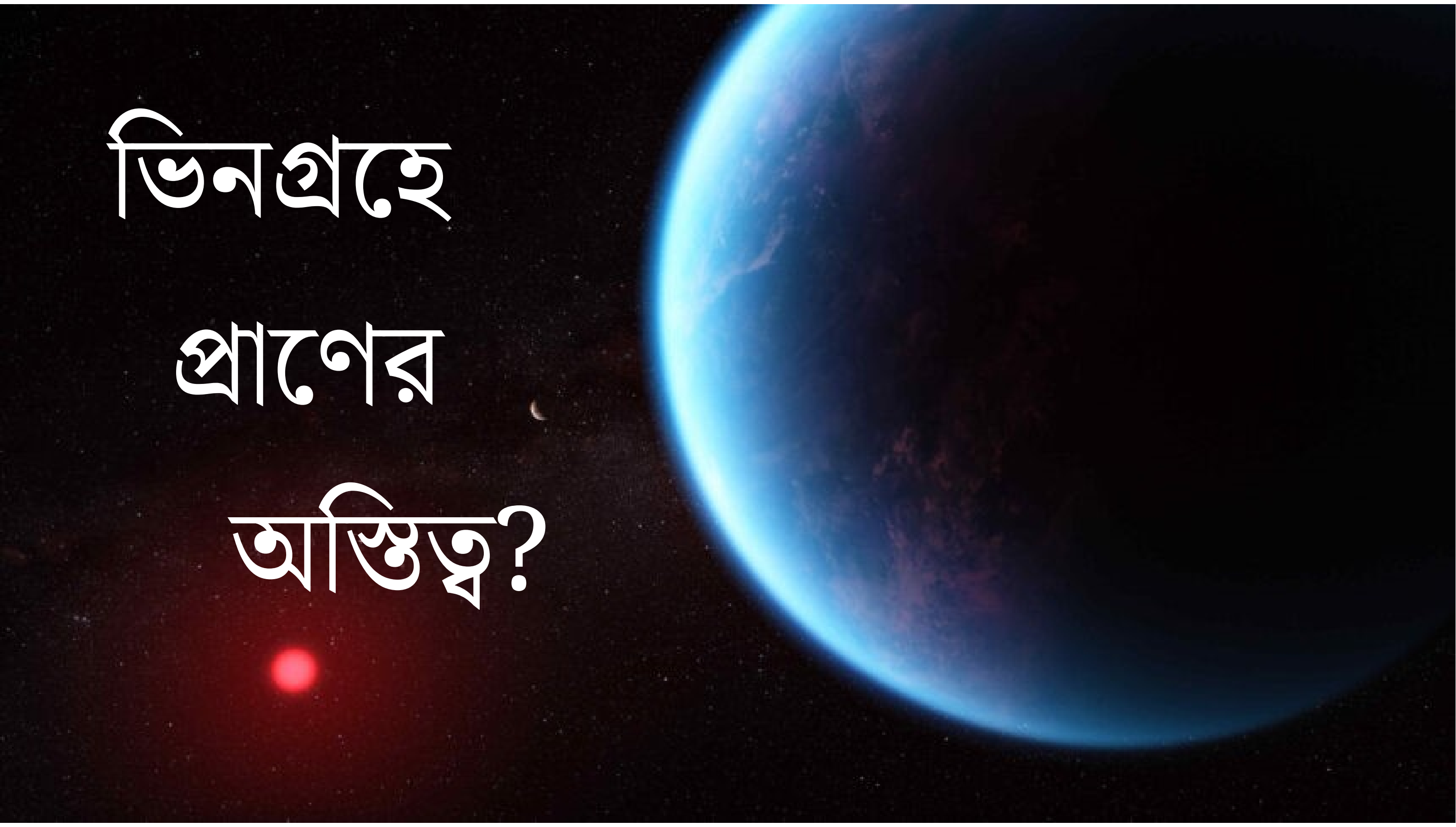

NASA/CSA/ESA/J. Olmsted (STScI)/N. Madhusudhan (Cambridge University)

গত ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বজুড়ে শিরোনামে এসেছেন এই দাবি নিয়ে যে, তারা "সৌরজগতের বাইরে জৈবিক কার্যকলাপের সবচেয়ে শক্তিশালী ইঙ্গিত" খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মতে, K2-18 b নামের একটি দূরবর্তী গ্রহের বায়ুমণ্ডলে এমন একটি বা একাধিক অণু পাওয়া গেছে, যেগুলো জীবের উপস্থিতির কারণে সৃষ্টি হতে পারে। তবে এই ঘোষণার পরপরই অন্যান্য গবেষকদের কাছ থেকে ব্যাপক সংশয় প্রকাশ পেয়েছে, যারা এক্সোপ্ল্যানেটের বায়ুমণ্ডলে এমন 'বায়োসিগনেচার' নিয়ে কাজ করেন।

বিজ্ঞানমহলে অনেকে বলছেন এটা খুব একটা শক্তিশালী প্রমাণ নয় আবার অনেকে বলছেন এসব অণু থাকলে নিশ্চিতভাবেই বলা যাবে না যে সে গ্রহে প্রাণ আছে।

আমরা এখন বিশ্লেষণ করবো যে কেন এই দাবিটা করা হয়েছে এবং কেন অনেক বিজ্ঞানী মনে করছেন এটি ভিনগ্রহের প্রাণের প্রমাণ থেকে অনেক দূরে।

কী পাওয়া গেছে?

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (JWST) ব্যবহার করে, যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বাধীন দলটি জানিয়েছে যে, তারা K2-18 b গ্রহের বায়ুমণ্ডলে ডাইমিথাইল সালফাইড (DMS) নামক একটি অণুর অস্তিত্বের ইঙ্গিত পেয়েছে। এই পদার্থটি একটি ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত যৌগ যা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে। K2-18 b একটি ছোট আকারের গ্রহ, নেপচুনের চেয়ে ছোট এবং পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৮ পারসেক (১২৫ আলোকবর্ষ) দূরে অবস্থিত।

প্রথমে কোনো এক্সোপ্ল্যানেটের বায়ুমন্ডলে কী আছে তা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া নিয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত ধারণা নেয়া যাক। এর জন্য প্রথমে পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপকে (যেমন জেমস ওয়েব) সেই গ্রহ যে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুড়ে, তার দিকে তাক করা হয়। তারপর যখন সেই গ্রহটি টেলিস্কোপ এবং নক্ষত্রের মাঝে চলে আসে তখন নক্ষত্র থেকে আসা আলো সেই গ্রহের বায়ুমন্ডলের কারণে বিভিন্ন আলোর স্পেকট্রামে নিজেদের ছাপ রেখে যায়।

তারাও এই অণুটি শনাক্ত করেছেন গ্রহটির বায়ুমণ্ডল দিয়ে নক্ষত্রের আলো ছেঁকে যাওয়ার সময়ের আলোক-স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ করে; কারণ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ আলোর স্পেকট্রামে স্বতন্ত্র ছাপ রেখে যায়। তথ্য বিশ্লেষণে এটাও

দেখা গেছে যে, ডাইমিথাইল সালফাইডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ডাইমিথাইল ডিসালফাইড (DMDS) নামের আরও একটি অণুও উপস্থিত থাকতে পারে — হয় DMS-এর পাশাপাশি অথবা DMS-এর বদলে। এই যৌগগুলো এতটা আকর্ষণ তৈরি করার কারণ পৃথিবীতে এগুলো সামুদ্রিক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের মতো জীব দ্বারা তৈরি হয়।

২০২৩ সালেও গবেষকরা অনুরূপ ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন। এবার নতুন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অনুসন্ধান করে তারা বলছেন, আগের চেয়ে আরও পরিষ্কার ও শক্তিশালী সংকেত পাওয়া গেছে।

একটি এত দূরবর্তী গ্রহের জটিল রসায়ন বিশ্লেষণ করা একটি বিরল কৃতিত্ব বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। "আমরা এক্সোপ্ল্যানেট বিজ্ঞান জগতে একটি বড় ধারণাগত পরিবর্তনের সাক্ষী হচ্ছি," ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ এ একটি লাইভস্ট্রিম করা আলোচনা সভায় বলেছিলেন দলের প্রধান, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিক্কু মধুসূদন।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?

বিজ্ঞানীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর বাইরের প্রাণ খুঁজে চলেছেন। যদি DMS এবং DMDS গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে সত্যিই থাকে, এবং যদি সেগুলো জৈবিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়ে থাকে — তাহলে এটি হবে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার।

এই গবেষণা K2-18 b-এর মতো গ্রহগুলোকে বোঝার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই ধরনের গ্রহগুলো — যেগুলোর সংখ্যা এখন পর্যন্ত মহাবিশ্বে চিহ্নিত হওয়া ৫,৮০০টির বেশি গ্রহের মধ্যে অন্যতম — সংখ্যায় খুবই বেশি। এদের ভরের ভিত্তিতে 'মিনি-নেপচুন' নামে ডাকা হয়, তবে এদের গঠন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। কিছু গবেষক, বিশেষ করে মধুসূদনের দল, মনে করেন এই গ্রহগুলো হাইড্রোজেনে ঘেরা জলজগৎ (water world) হতে পারে, যেগুলিতে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকতে পারে।

অন্য গবেষকরা কেন সন্দিহান?

প্রথমত, প্রশ্ন উঠছে — আদৌ কি K2-18 b-তে পানি আছে? অথবা এমন কোনও পৃষ্ঠ আছে যা প্রাণ ধারণ করতে পারে? এই গ্রহ এবং এর মতো অন্যান্যদের মডেলিং বিশ্লেষণ বলছে, এরা সম্ভবত একেবারেই প্রাণ ধারণে অযোগ্য। কিছু গ্রহবিজ্ঞানী বলছেন যে, একটি প্রাণহীন মিনি-নেপচুন হওয়ার ব্যাখ্যাই সবচেয়ে সরল এবং উপযুক্ত।

এরপর আসে প্রশ্ন — DMS বা DMDS আসলেই কি আছে? নাকি সেই সংকেতটি ভুল বা বিভ্রান্তিকর? ক্যামব্রিজ দলের পরিমাপ জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ যতটা পারে, তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে।

স্টিফেন শ্মিড ও তার সহকর্মীরা সম্প্রতি ক্যামব্রিজ দলের ২০২৩ সালের দাবিকে পুনরায় বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাতে কোনও বায়োসিগনেচার অণুর প্রমাণ পাননি। শ্মিড বলেন, নতুন পর্যবেক্ষণ "খুবই গোলমেলে", এবং "যে বৈশিষ্ট্যগুলো রিপোর্ট করা হয়েছে, সেগুলো এখনও কেবল পরিসংখ্যানগত ভিন্নতার ফল হতে পারে।" তবে ক্যামব্রিজের গবেষকরা বলছেন, এই সংকেত কেবল কাকতালীয়ভাবে পাওয়া গেছে এমন সম্ভাবনা মাত্র ০.৩ শতাংশ।

"K2-18 b ছোট আকারের গ্রহ, নেপচুনের চেয়ে ছোট এবং পৃথিবী থেকে প্রায় ১২৫ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত"

সবশেষে, যদি সংকেতটি বাস্তবও হয়, তাহলে সেটিকে প্রাণের উৎস বলে ধরার আগে আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, বলছেন অন্যান্য গবেষকেরা। উদাহরণস্বরূপ, গবেষণাগারে প্রমাণ মিলেছে যে DMS জীবনের সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই, অর্থাৎ অ্যাবায়োটিক (abiotic) পদ্ধতিতে তৈরি হতে পারে। "এই ধরনের বায়ুমণ্ডলের রসায়ন সম্পর্কে আমরা খুবই অল্প জানি," বলছেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় বোল্ডারের রসায়নবিদ এলিনর ব্রাউন, যিনি সেই গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। অন্য গবেষণায়ও দেখা গেছে যে, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির পর্যবেক্ষণ করা একটি ধূমকেতুতেও DMS পাওয়া গেছে — যেখানে নিশ্চিতভাবেই কোনও প্রাণ নেই।

"প্রাসঙ্গিক গ্রহীয় অবস্থা (planetary context) খুব গুরুত্বপূর্ণ," বলছেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, রিভারসাইড-এর অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্ট এডওয়ার্ড শভিটারম্যান। তিনি বলেন, যদি এই অণুগুলো সত্যিই গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে থাকে, "তাহলে প্রথমেই আমাদের ভাবতে হবে, কীভাবে অ্যাবায়োটিক উপায়ে অনেক বেশি পরিমাণে এটি তৈরি হতে পারে, এবং সেই সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখতে

হবে — তারপরই একে প্রাণের প্রমাণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।”

এরপর কী হবে?

মধুসূদন ও তার দল JWST-তে আরও পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়ার আশায় আছেন, যাতে তাদের দাবির পরিসংখ্যানগত গুরুত্ব আরও নিশ্চিতভাবে যাচাই করা যায়। এর বাইরেও, শভিটারম্যান বলছেন, “যেটা আমরা দেখতে চাই, তা হলো একাধিক স্বাধীন গবেষণা দলের মাধ্যমে এই ফলাফলের স্বতন্ত্রভাবে যাচাই।”

এই দাবিটি শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হোক বা না হোক, K2-18 b-এর মতো গ্রহগুলো অধ্যয়নের গুরুত্বকে সামনে এনেছে বলে মনে করেন লরা ক্রেইডবার্গ: “এই ধরনের গ্রহগুলো আমাদের জন্য একটি অসাধারণ প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে আমরা গ্রহের বায়ুমণ্ডল কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে পারি।”

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

জ্যোতির্বিজ্ঞান

মহাবিশ্ব প্রতি ৫০০ বিলিয়ন বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে করা নতুন এক গবেষণায় এমনটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আমাদের মহাবিশ্ব ঘুড়ছে তবে সেটা খুবই ধীরে।

১৯২৯ সালে জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল এক গবেষণা পত্রে দেখান যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। এই আবিষ্কার থেকেই আসে "হাবল ধ্রুবক" — একটি সংখ্যা যা জানায় মহাবিশ্ব কত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।

কিন্তু এই প্রসারণের হার নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, যাকে বলা হয় "হাবল টেনশন"। কারণ, মহাবিশ্বের প্রসারণের হার নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন জ্যোতির্বস্তুর ওপর ভিত্তি করে পাওয়া ফলাফলগুলোতে ১০% পর্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য একদল গবেষক একটি নতুন গাণিতিক মডেল তৈরি করেছেন, যেখানে ধরা হয়েছে মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে ঘুরছে।

২০২৫ সালের মার্চে *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* নামক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় বলা হয়েছে, মহাবিশ্ব প্রতি ৫০০ বিলিয়ন বছরে একবার সম্পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করে। এই অতিস্বল্প গতির ঘূর্ণন হাবল ধ্রুবকের পরিমাপের অসামঞ্জস্য দূর করতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের প্রসারণ হার নির্ণয়ের জন্য সাধারণত দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করেন—একটি হলো সুপারনোভা বিশ্লেষণ, যেখানে তারা মহাজাগতিক দূরত্বে বিস্ফোরিত তারার আলোর স্থলন বিশ্লেষণ করেন। আরেকটি পদ্ধতি হলো কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন (CMB)। এই দুটি পদ্ধতিতে পাওয়া ফলাফলের মধ্যে প্রায় ১০% পার্থক্য দেখা যায়। আর সেখানেই দেখা দেয় 'হাবল টেনশন'।

মহাবিশ্ব নিজে ঘূর্ণনশীল হতে পারে এই ধারণা নতুন নয়। বিখ্যাত গণিতবিদ কার্ট গ্যোডেল ১৯৪৯ সালে *Reviews of Modern Physics* জার্নালে এই ধারণা উত্থাপন করেছিলেন। স্টিফেন হকিং-সহ আরও অনেক বিজ্ঞানীও এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন।

নতুন গবেষণায়, গবেষকরা ধারণা করেছেন যেহেতু সমস্ত মহাজাগতিক বস্তু—যেমন গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, এমনকি ব্ল্যাক হোলও ঘূর্ণন করে—তাই মহাবিশ্ব নিজেও স্বাভাবিকভাবে ঘূর্ণন করতে পারে।

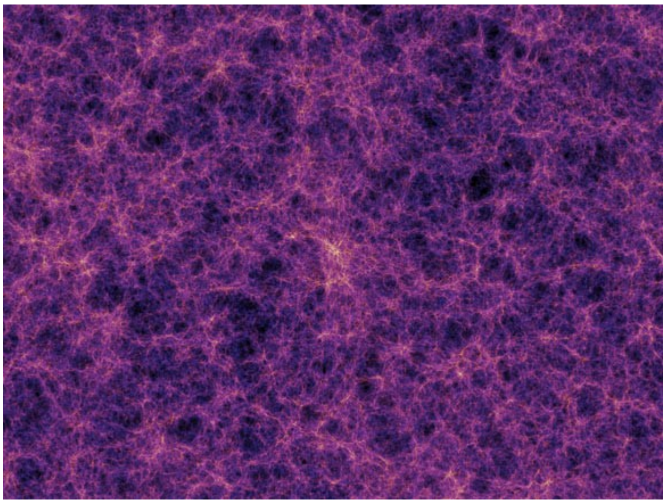

মহাবিশ্বের গঠনে মহাকর্ষ শক্তি একটি বিশাল জালাকৃতির কাঠামো তৈরি করে, যেটি "কসমিক ওয়েব" নামে পরিচিত। এটি অদৃশ্য সেতুর মতো ফিলামেন্টের মাধ্যমে গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সি ক্লাস্টারগুলোকে শত শত কোটি আলোকবর্ষ দীর্ঘ ব্যবধানে একে অন্যের সাথে যুক্ত করে (Max Planck Institute for Astrophysics)

গবেষক সাপুদি বলেন, "আমরা খুব অবাক হয়েছিলাম যখন দেখলাম, আমাদের এই ঘূর্ণন মডেল বর্তমান জ্যোতির্বিদ্যাগত তথ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়ে বরং হাবল টেনশন সমস্যার একটি সম্ভাব্য সমাধান দিচ্ছে।"

যদিও এই ঘূর্ণন এত ধীর যে সরাসরি পরিমাপ করা সম্ভব নয়, তবুও এটি মহাবিশ্বের প্রসারণ হারে প্রভাব ফেলতে পারে এবং এর জন্য নতুন ধরনের কোনো থিয়োরির প্রয়োজন হয় না।

তবে গবেষণাটিতে সব ধরনের পদার্থবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সাপুদি বলেন, "আমরা মূলত নিউটোনিয়ান পদার্থবিদ্যা ব্যবহার করেছি, কিছুটা জেনারেল রিলেটিভিটির ইনপুট নিয়ে। একটি সম্পূর্ণ জেনারেল রিলেটিভিটি বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে দরকার।"

তিনি আরও বলেন, তাদের মডেলটি ধরে নিয়েছে যে মহাবিশ্ব সমজাতীয় এবং সময়ের সঙ্গে তার ঘনত্বে কোনো পরিবর্তন

হয়নি। ভবিষ্যতের গবেষণায় তাঁরা এই ঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের মডেলটিকে অন্যান্য কসমোলজিক্যাল মডেলের সঙ্গে তুলনা করবেন।

চূড়ান্তভাবে, এই গবেষণা মহাবিশ্বের প্রকৃতি নিয়ে আমাদের ধারণা নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে—হয়তো আমাদের চারপাশের সবকিছু ধীরে ধীরে ঘুরছে, এমনকি মহাবিশ্ব নিজেও।

রেফারেন্স: DOI: 10.1093/mnras/staf446

লেখক: অরুণিমা তানহা

জ্যোতির্বিজ্ঞান

প্রাগৈতিহাসিক কিংবদন্তি, আধুনিক বিজ্ঞানের পুনর্নির্মাণ

কলোসাল বায়োসায়েন্সেস আধুনিক জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধূসর নেকড়ের জিন সম্পাদনার মাধ্যমে ডায়ার নেকড়ে সদৃশ তিনটি বাচ্চা তৈরি করেছে। যদিও এগুলো আসল ডায়ার নেকড়ে (Aenocyon dirus) নয়, তবুও এ গবেষণা বিলুপ্ত প্রাণী ফিরিয়ে আনার পথে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

Colossal Biosciences

ডায়ার উলফ বা ডায়ার নেকড়ে (*Aenocyon dirus*) ছিল এক ভয়ংকর ক্যানিড প্রজাতি, যা অতীতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচরণ করত। এই প্রজাতির অস্তিত্ব মিলেছিল প্রায় ১,২৫,০০০ বছর আগে থেকে শুরু করে ১০,০০০ বছর আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্লাইস্টোসিন যুগের শেষ প্রান্ত এবং হলোসিন যুগের প্রারম্ভে। ১৮৫৮ সালে প্রথম জীবাশ্ম আবিষ্কারের চার বছর পরে এই প্রজাতির নামকরণ করা হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এদের দুটি উপপ্রজাতি চিহ্নিত করেছেন—*Aenocyon dirus guildayi* এবং *Aenocyon dirus dirus*।

ডায়ার নেকড়ের জীবাশ্মের বৃহত্তম সংগ্রহ লস অ্যাঞ্জেলেসের বিখ্যাত র‍্যাঞ্চো লা ব্রেয়া টার পিটসে পাওয়া গেছে। যদিও তারা বাস্তবে বিলুপ্ত হলেও লোককথা এবং সাহিত্যে তাদের উপস্থিতি আজও জীবন্ত। জর্জ আর. আর. মার্টিনের জনপ্রিয় উপন্যাস ‘A Song of Ice and Fire’ (যার উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে ‘Game of Thrones’), ডায়ার নেকড়েকে নতুন করে জনপ্রিয় করে তোলে। এই গল্পে স্টার্ক

পরিবারের প্রতীক এবং পরিবারের প্রতিটি সন্তানের একেকটি ডায়ার নেকড়ে ছিলো।

বেশি বড়, মোটা গা, গাঢ় রঙের লোম, এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী চোয়ালসহ এরা দেখতে ছিল আধুনিক ধূসর নেকড়ের মতো হলেও আকারে অনেকটাই বিশাল ও বেশি ভয়ংকর। তাদের খাদ্যতালিকায় ছিল হিমযুগীয় বাইসন, ঘোড়া এমনকি ম্যামথের মতো বিশালকায় প্রাণীও। ধারণা করা হয়, প্রায় ১০,০০০ বছর আগে এই প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়: ডায়ার নেকড়ে ফিরে এসেছে?

২০২৫ সালের ৮ এপ্রিল, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জৈবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান Colossal Biosciences ঘোষণা দেয়, তারা সফলভাবে তিনটি 'ডায়ার নেকড়ে' সদৃশ বাচ্চার জন্ম দিতে পেরেছে। তাদের নাম রাখা হয়েছে রমুলাস, রেমাস এবং খালেসি।

প্রশ্ন হলো, এই নবজাত বাচ্চাগুলো কি সত্যিই বিলুপ্ত *Aenocyon dirus*? আদতেই কি ডায়ার নেকড়ের পুনর্জন্ম ঘটেছে? নাকি এটি শুধুই বিজ্ঞানের আরেকটি অনুকরণ কৌশল?

ডায়ার নেকড়ে ফিরেছে—নাকি ফিরিয়ে আনার অভিনয়?

যারা মনে করছেন, বিজ্ঞানীরা আসল *Aenocyon dirus* প্রজাতিকে ফিরিয়ে এনেছেন, তারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। বাস্তবতা হলো, এই নতুন বাচ্চাগুলো সম্পূর্ণভাবে ধূসর নেকড়ের জিনগত রূপান্তর মাত্র। অর্থাৎ এরা জেনেটিক এবং শ্রেণিবিন্যাসের দিক থেকে *Canis lupus*, *Aenocyon dirus* নয়। মূল ডায়ার নেকড়েকে এখনো ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। তবে কেন এত আলোচনা, এত দাবি?

তাহলে কি কারণে ফিরিয়ে আনা গেল না ডায়ার নেকড়েকে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হবে ১৯৯৬ সালে, যখন প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী 'ডলি' ভেড়ার ক্লোন তৈরি করা হয়েছিল। প্রক্রিয়াটি তুলনামূলকভাবে সহজ—প্রথমে দাতার কোষ থেকে নিউক্লিয়াস সংগ্রহ করে তা একই প্রজাতির একটি ডিম্বাণুতে বসানো হয়। তারপর সেই নিষিক্ত কোষ রাখা হয় সারোগেট মায়ের গর্ভে, এবং জন্ম হয় ক্লোন ডলির।

কিন্তু বিলুপ্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেক জটিল। কারণ সেখানে কোনো জীবিত কোষ বা পূর্ণাঙ্গ জিনোম থাকে না। প্রাচীন ডিএনএ সাধারণত খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হয়, ফলে তাকে কাজে লাগিয়ে পুরো প্রাণী তৈরি করা কঠিন। তাহলে Colossal কী করেছে?

যা তারা করেছে, তা হলো জেনেটিক অনুকরণ

Colossal Biosciences প্রথমে ১৩,০০০ বছর পুরনো ডায়ার নেকড়ের দাঁত এবং ৭২,০০০ বছর পুরনো একটি খুলি থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ধূসর নেকড়ের সঙ্গে ডায়ার নেকড়ের জিনগত পার্থক্য খুঁজে পান, যার মধ্যে ২০টির মতো জিন ছিল এই পার্থক্যের মূল উৎস। এই জিনগুলোই ডায়ার নেকড়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য তৈরি করত—যেমন দৈত্যাকার দেহ, সাদা গাঢ় লোম, চওড়া কপাল, ধারালো দাঁত, ভয়াল গর্জন।

এরপর বিজ্ঞানীরা CRISPR-Cas9 প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধূসর নেকড়ের ডিএনএ-তে ডায়ার নেকড়ের এই নির্দিষ্ট জিনগুলো প্রতিস্থাপন করেন। CRISPR একধরনের "জেনেটিক কাঁচি", যা ডিএনএর নির্দিষ্ট অংশ কেটে সেখানে নতুন তথ্য বসাতে সক্ষম। ঠিক যেভাবে একটি ভুল বানান ঠিক করতে ওয়ার্ড ডকুমেন্টে কাট-পেস্ট করা হয়, তেমনই।

এই প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানীরা মারাত্মক সতর্কতার সাথে এগিয়েছেন। একটি ভুল জিন প্রবেশ করালেই অন্ধত্ব, বধিরতা বা অন্য কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারত। ধূসর নেকড়ের তিনটি রঙ নিয়ন্ত্রণকারী জিন ঠিকভাবে প্রতিস্থাপন করতে না পারলে জটিলতা সৃষ্টি হতো।

সব ঠিক থাকলে, সম্পাদিত কোষ থেকে নিউক্লিয়াস বের করে ধূসর নেকড়ের ডিম্বাণুতে বসানো হয়। তারপর ক্লোন করা নিষিক্ত কোষগুলো স্থানান্তর করা হয় কুকুরের গর্ভে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সারোগেট মা হিসেবে গৃহপালিত কুকুর ব্যবহৃত হয়েছে।

কুকুর? নেকড়ে নয়? কেন?

কারণ ধূসর নেকড়ে একটি বন্য প্রজাতি, যাদের গর্ভধারণ করানো কঠিন। তারা স্ট্রেসে ভোগে, আগ্রাসী হয়ে ওঠে, এবং গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে না।

অপরদিকে গৃহপালিত কুকুর জেনেটিকভাবে ধূসর নেকড়ের সঙ্গে ৯৯.৯৯% মিল রাখে, এবং গর্ভকালীন সময়, শরীরের গঠন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও প্রায় এক।

ফলে কুকুরের গর্ভেই জন্ম নেয় দুটি বাচ্চা—রমুলাস ও রেমাস, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে। পরে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে খালেসি নামের আরেকটি শাবক জন্মায়।

এই শাবকরা আসলে কে?

এই তিনটি বাচ্চা সম্পূর্ণরূপে ধূসর নেকড়ে, তবে তাদের জিনের মধ্যে ডায়ার নেকড়ের কিছু বৈশিষ্ট্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, *Aenocyon dirus* ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি—শুধু তার কিছু চেহারা ও আচরণগত গুণাবলি আধুনিক নেকড়ের শরীরে বসানো হয়েছে।

তাহলে পুরো ডায়ার নেকড়ে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব কেন? – এর প্রধান কারণ হলো, এখন পর্যন্ত ডায়ার নেকড়ের সম্পূর্ণ জিনোম মানচিত্র (genome sequence) আমাদের হাতে নেই। তা পাওয়াও প্রায় অসম্ভব, কারণ প্রাচীন ডিএনএ ক্ষয়প্রাপ্ত, এবং কার্যকর কোষ তো নেই-ই। জিনোম থাকলেও, তা কোথায় বসাবো? তাছাড়া এমন ডিম্বাণু বা গর্ভাশয় নেই যা *Aenocyon dirus*-এর মতো প্রাণী তৈরি করতে পারে।

এছাড়াও, শুধুমাত্র ডিএনএ থাকলেই প্রাণী তৈরি হয় না। দরকার এপিজেনেটিক (epigenetic) তথ্য, যা নির্ধারণ করে কোন জিন কখন চালু হবে বা বন্ধ থাকবে। এই তথ্য আমাদের কাছে ডায়ার নেকড়ের ক্ষেত্রে একেবারেই অজানা।

তাহলে কি এই গবেষণার সবই ব্যর্থ?

একেবারেই না। Colossal Biosciences-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতিমান জেনেটিক বিজ্ঞানী ড. জর্জ চার্চ বলছেন, এটি ডি-এক্সটিংশন বা বিলুপ্ত প্রাণী ফিরিয়ে আনার পথে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি একটি সাহসী সূচনা।

Colossal গবেষণায় আরও একাধিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে। যেমন, তারা ধূসর নেকড়ের রক্ত থেকে এন্ডোথেলিয়াল প্রোজেনিটর কোষ (EPCs) সংগ্রহের একটি নতুন পদ্ধতি তৈরি করেছে, যা ক্লোনিং ও জিন সম্পাদনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

এই অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে তারা ম্যামোথ, তাসমানিয়ান টাইগারসহ আরও অনেক বিলুপ্ত প্রাণীকে ফিরে আনার চেষ্টা করবে।

Colossal-এর উপদেষ্টা অ্যান্ড্রু পাস্ক বলেন, “ডায়ার নেকড়ের এই প্রকল্পটি দেখিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের হাতে এখন প্রকৃতির হারানো বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনার শক্তি রয়েছে।”

কলোসাল বায়োসায়েন্সেস আরও জানায়, তারা নতুন একটি ‘নন-ইনভেসিভ ব্লাড ক্লোনিং’ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিপন্ন প্রজাতির লাল নেকড়ে (Canis rufus)-এর দুইটি ক্লোনজাত বংশ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া গতমাসে (মার্চ ২০২৫) তারা জিন সম্পাদনার মাধ্যমে ম্যামথের মতো বৈশিষ্ট্যযুক্ত “উলি মাউস” বা লোমশ ইঁদুরের জন্ম দিয়েছে।

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

জেনেটিক্স

পেস্তা বাদামের জিনোম সিকোয়েন্স

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস-এর গবেষকেরা বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি চাষ হওয়া পেস্তা জাত 'কারমান' (Kerman)-এর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রোমোজোমভিত্তিক রেফারেন্স জিনোম তৈরি করেছেন।

স্বাদ ও স্বাস্থ্যগুণের জন্য পেস্তা বাদাম বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এটি শুধু একটি মুখরোচক স্ন্যাক নয়, বরং একটি জলবায়ু সহনশীল এবং বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসেবে নতুন করে মনোযোগ পাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস-এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় পেস্তা বাদাম (*Pistacia vera*)-এর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত জিনগত মানচিত্র (genetic map) তৈরি হয়েছে, যা এই ফসলের চাষাবাদ এবং পুষ্টিমূল্য নিয়ে বৈপ্লবিক উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

পেস্তা বাদাম আনাকার্ডিয়াসি (Anacardiaceae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে কাজু ও আমের মতো গাছও রয়েছে। এটি আসলে পুরোপুরি বাদাম নয়, বরং একটি ‘ডিহিসেন্ট ড্রুপ’—

যার বাইরের চামড়ার মতো আবরণ, শক্ত খোল এবং ভোজ্য বীজ বা কার্নেল থাকে। শুধু স্বাদের জন্য নয়, এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রয়োজনীয় ভিটামিন, যা একে একটি পুষ্টিগুণে ভরপুর খাদ্য উপাদানে পরিণত করেছে।

NoName_13/Pixabay

শুষ্কতা ও লবণাক্ততার মতো কঠিন পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ সহ্য করার ক্ষমতার কারণে, পেস্তা গাছকে এখন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে একটি টেকসই খাদ্য উৎস হিসেবে দেখা হচ্ছে। গত দুই দশকে বিশ্বজুড়ে পেস্তা উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, যা এই ফসলের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে প্রমাণ করে।

নতুন রেফারেন্স জিনোম তৈরি এই গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। গবেষক ড. জে. গ্রে মনরো বলেন, “এই জিনগত নির্ভুলতার উন্নতি হাতে আঁকা মানচিত্র থেকে স্যাটেলাইট চিত্রে যাওয়ার মতো।” এই উন্নত স্পষ্টতা বিজ্ঞানী ও কৃষকদের জন্য গাছটির আণবিক ও শারীরবৃত্তীয় গঠন আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ করে দেয়।

এই গবেষণার একটি বড় সাফল্য হলো পেস্তা গাছের বিকাশের চারটি প্রধান ধাপ চিহ্নিত করা—ফুল ফোটার মুহূর্ত থেকে শুরু করে ফসল তোলার সময় পর্যন্ত। এই বিকাশমান মানচিত্রে খোল শক্ত হওয়া ও বীজের বৃদ্ধি-সহ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে। এই তথ্যের মাধ্যমে কৃষকেরা সেচের সময়সূচি ঠিক করতে, ফসল তোলার কৌশল উন্নত করতে এবং কীট বা ছত্রাকের আক্রমণে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পারবেন।

তবে গবেষণাটি শুধু গাছের শারীরিক পরিবর্তন নিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। এটি পেস্তা বাদামের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন জিন ও আণবিক প্রক্রিয়াগুলোও বিশ্লেষণ করেছে। গবেষকেরা বেশ কিছু জিন এবং বায়োকেমিক্যাল পথ চিহ্নিত করেছেন, যা প্রোটিন ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সঞ্চয়ে ভূমিকা রাখে—যা পেস্তা বাদামের পুষ্টিমূল্য ও সংরক্ষণ ক্ষমতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

গবেষণক ড. বারবারা ব্লাঙ্কো-উলাতে বলেন, “এই জিনগত তথ্য চাষিদের হাতে কার্যকরী তথ্য তুলে দেয়, যা পেস্তার মান ও টেকসই উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে। এটি আরও ভালো ফসল ব্যবস্থাপনা ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রজনন কৌশলের দরজা খুলে দেয়।”

জলবায়ুর চাপ দিন দিন বাড়ছে এবং সাথে সাথে পুষ্টিকর ও টেকসই ফসলের চাহিদা বাড়তে থাকায়, পেস্তা বাদাম ভবিষ্যতে বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে—এবার বিজ্ঞানের সহযোগিতায় আরও সুনির্দিষ্ট পথে।

রেফারেন্স: *DOI: 10.1111/nph.70060*

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

জেনেটিক্স

মটরশুঁটি নিয়ে শতাব্দী পুরোনো জেনেটিক রহস্য সমাধান

গ্রেগর মেন্ডেলের মটরগাছ নিয়ে করা ঐতিহাসিক গবেষণার বাকি থাকা তিনটি রহস্যজনক বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিনগুলো অবশেষে বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করেছেন। আধুনিক জিনোমিক প্রযুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুঁটির রঙ, আকার ও ফুলের গঠনের পেছনের জিনগত কারণ উদঘাটিত হয়েছে। এই গবেষণা শুধু ঐতিহাসিক ধাঁধার সমাধানই করে নি, বরং ভবিষ্যতের উদ্ভিদ প্রজনন ও প্রোটিনসমৃদ্ধ ফসল উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বারও খুলে দিয়েছে।

অস্ট্রিয়ান সন্ন্যাসী গ্রেগর জোহান মেন্ডেল ১৬০ বছরেরও বেশি আগে মটরশুঁটির সাতটি বৈশিষ্ট্য *(যেমন বীজ ও ফলের আকার, রঙ ইত্যাদি)* মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে বংশগতির উপর তাঁর যুগান্তকারী কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরেও বিজ্ঞানীরা এখনও মটরশুঁটির ওই সাতটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনটির জন্য সুনির্দিষ্ট কোন জিন দায়ী, তা নির্ধারণ করতে পারেননি।

২৩ এপ্রিল, ২০২৫ এ *Nature* জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা মেন্ডেলের এই গুরুত্বপূর্ণ গল্পে নতুন একটি অধ্যায় যোগ করেছেন, যা হয়তো মটরশুঁটির জিনোম সংক্রান্ত গবেষণায় এক নতুন যুগের সূচনা করতে পারে।

২০১৯ সালে *Pisum sativum* (মটরশুঁটি) উদ্ভিদের জন্য একটি রেফারেন্স জিনোম প্রকাশ করা হয়। এটি ছিল ডিজিটালভাবে উপস্থাপিত উদ্ভিদটির ডিএনএ সিকোয়েন্স। ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটির প্ল্যান্ট জেনেটিসিস্ট ক্লেয়ার কোয়েন বলেন, "এটা ছিল একটি বিশাল অগ্রগতি। তবে আমি বলব [সাম্প্রতিক গবেষণাটি] আরও বড় সাফল্য। এটা সত্যিই একটি অসাধারণ প্রচেষ্টা।"

প্রাচীন রহস্যের সমাধানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে সাফল্য

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'সিটিজেন সায়েন্টিস্ট' মেন্ডেল প্রায় ২৮,০০০টি মটরশুঁটি গাছের সংকরায়ণ করে পরীক্ষা করেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মে বৈশিষ্ট্য কীভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে যায়। সে সময় 'জিন' ধারণাটি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি, তবুও মেনডেল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে উদ্ভিদগুলো তাদের সন্তানদের মধ্যে কিছু 'বংশগত উপাদান' পাঠায় যা নির্ধারণ করে তারা কোন বৈশিষ্ট্য পাবে—যা আজকে আমরা 'ডমিন্যান্ট' ও 'রিসেসিভ' জিন বা অ্যালিল হিসেবে জানি। আজও বিজ্ঞানীরা এই মেনডেলীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করছেন এবং হাজার হাজার এমন বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যেও চিহ্নিত হয়েছে। তবে অনেক বৈশিষ্ট্য এখনও নির্দিষ্ট কোন জিনের সাথে সম্পর্কিত করা যায়নি—মেনডেলের সাতটি মটর বৈশিষ্ট্যের তিনটিও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

গবেষণাটির গবেষক এবং যুক্তরাজ্যের নরউইচে অবস্থিত জন ইনেস সেন্টারের (JIC) ফসল জিনতত্ত্ববিদ নোয়াম চায়ুট, জানান যে এই দীর্ঘস্থায়ী রহস্য তাদের আগ্রহ জাগিয়েছিল। তিনি বলেন, "আমরা মনে করেছি জিনোম সিকোয়েন্সিং ও কম্পিউটেশনাল টুলগুলো এখন এতটাই উন্নত যে এই শেষ তিনটি জিনের রহস্য আমরা এবার বুঝতে পারব।"

JIC-এর জার্মপ্লাজম রিসোর্স ইউনিট ব্যবহার করে (যেখানে ৩,৫০০-রও বেশি মটরের জাত সংরক্ষিত রয়েছে এবং সঙ্গে পাবলিকলি অ্যাক্সেসযোগ্য জেনোমিক ডেটাসেট) তারা প্রায় ৭০০টি মটরের জিনোম সংগ্রহ করে গভীরভাবে সিকোয়েন্স করেন। এসব জিনোমে প্রায় ১৫ কোটি ৫০ লাখ 'সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম' (SNP) পাওয়া যায়—যা হলো ডিএনএ সিকোয়েন্সের একক বেস-জোড়ার পার্থক্য, যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড বা রেফারেন্স *Pisum sativum* জেনোমের সাথে তুলনা করে ধরা পড়ে।

imageBROKER/Alamy

বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে (যার মধ্যে ছিল মটরগাছের বাছাইকৃত সংকরায়ণ এবং জিনোম-ওয়াইড অ্যাসোসিয়েশন স্টাডি (GWAS), যা প্রতিটি জিনোমে SNP-এর সংখ্যা ও অবস্থানের পার্থক্য খোঁজে) গবেষক দল অবশেষে বাকি থাকা তিনটি বৈশিষ্ট্যের সাথে সংশ্লিষ্ট জিন শনাক্ত করেন। নির্দিষ্টভাবে, তারা দেখেছেন যে মটরের ফল বা শুঁটির রঙ একটি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা ক্লোরোফিল তৈরির প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে, ফলে শুঁটি হয় সবুজ বা হলুদ রঙের। তাঁরা আরও দুটি জিন চিহ্নিত করেছেন যেগুলো সম্ভবত কোষ প্রাচীর ঘন হওয়ার প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে শুঁটির আকার নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। আর একটি নির্দিষ্ট জিনের জেনেটিক কোডে একটি অংশ মুছে গেলে গাছে ফুলের শাখা বা গুচ্ছ গঠনে পরিবর্তন আসে — যাকে বলে fasciation।

দীর্ঘ পথচলা

এই বিভিন্ন পদ্ধতি একত্র করে গবেষণার কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে ছয় বছর। চায়ুট বলেন, "এই গবেষণার

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুন্দর দিক হলো একসাথে কাজ করা।”

সাউথ ক্যারোলিনার ক্লেমসন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ প্রজননবিদ জেনা হার্শবার্গার বলেন, এই গবেষণা যেন তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখা Punnett square-এর পাঠগুলোকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে *(Punnett square হলো এমন একটি চিত্র, যা অভিভাবকদের জিনের ভিত্তিতে সন্তানের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়ার সম্ভাবনা পূর্বানুমান করতে ব্যবহৃত হয়)* । তিনি আরো বলেন, “গবেষকরা শুধু একটি ঐতিহাসিক রহস্যই সমাধান করেননি, বরং এমন একটি সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডারও তৈরি করেছেন যা শুধু ভবিষ্যতের মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণার জন্য নয়, বরং ব্যবহারিক প্রজননের ক্ষেত্রেও কাজে আসবে।”

এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সাথে জিন সংযোগ করার পাশাপাশি, দলটি আরও ৭২টি গুরুত্বপূর্ণ মটরের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। চায়ুট বলেন, এই উন্মুক্ত ডেটাসেটে এখনও অগণিত তথ্য রয়েছে যা বিশ্লেষণ করার অপেক্ষায় আছে। মটর প্রোটিনের বাজার বর্তমানে বিকল্প প্রোটিন উৎসগুলোর মধ্যে দ্রুততম হারে বাড়ছে, আর গবেষকরা আরও ফলনশীল মটর উদ্ভিদ তৈরির উপায় জানতে চান। উদাহরণস্বরূপ, চায়ুট আগ্রহী শুঁটির আকার, গাছের উৎপাদনক্ষমতা ও বীজের প্রোটিন উপাদানের সাথে সম্পর্কিত জিন নিয়ে গবেষণায়। আর কোয়েন আগ্রহী রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধির পেছনে কাজ করা জিন শনাক্ত করতে।

চায়ুট বলেন, “একজন ফলিত বিজ্ঞানী হিসেবে আমি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী এই গবেষণার ফলাফলগুলো ব্যবহার করে কীভাবে আমাদের ফসল উন্নত ও সংরক্ষণ করা যায়, সেটা জানার প্রতি। আর এই ডেটা দিয়ে সত্যিই অসংখ্য কাজ করা সম্ভব।”

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-08891-6*

লেখক: তাশফিয়া নুজহাত প্রজ্ঞা

অণুজীববিজ্ঞান

বিদ্যুৎ পরিবাহী ব্যাকটেরিয়া

বিদ্যুৎ পরিবাহী কেবল ব্যাকটেরিয়া হলো এক ধরনের বহুকোষী প্রোক্যারিওট, যারা সামুদ্রিক ও মিঠা পানির তলদেশের পলিমাটিতে সেন্টিমিটার-ব্যাপী দূরত্বে ইলেকট্রন স্থানান্তর করতে সক্ষম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগনের ইয়াকুইনা উপসাগরের একটি জোয়ার-ভাটার মোহনার কাদামাটি থেকে জীববিজ্ঞানীরা এই ব্যাকটেরিয়ার নতুন একটি প্রজাতি আলাদা করে শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করেছেন।

Food Safety Magazine

ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক কেবল ব্যাকটেরিয়ার একটি নতুন প্রজাতি শনাক্ত করেছেন, যার গঠনগত ও বিপাকীয় বৈশিষ্ট্য একে পরিবেশ দূষণ মোকাবেলা ও বায়োইলেকট্রনিক্সে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। ওরেগনের ইয়াকুইনা উপসাগরের কাদামাটিতে এই ব্যাকটেরিয়াটি আবিষ্কৃত হয়েছে। গবেষকরা এর নাম দিয়েছেন *Candidatus Electrothrix yaqonensis*, ইয়াকোনা জনগোষ্ঠীর সম্মানে—যাদের পূর্বপুরুষের ভূমির মধ্যে এই উপসাগর অন্তর্ভুক্ত।

কেবল ব্যাকটেরিয়া সুপরিচিত তাদের বিস্ময়কর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ক্ষমতার জন্য, যা পানির তলদেশের পলিমাটির মধ্যে সেন্টিমিটার দূরত্বেও ইলেকট্রন স্থানান্তর করতে পারে। এই নতুন প্রজাতি এই কাজ করে ইলেক্ট্রোজেনিক সালফাইড অক্সিডেশন প্রক্রিয়ায়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে পলিমাটির গভীরে সালফাইড-সমৃদ্ধ স্তর থেকে ইলেকট্রন সংগ্রহ করে এগুলো অক্সিজেন বা নাইট্রেটের মতো গ্রহণকারীর কাছে পৌঁছে দেয় মাটির উপরের দিকে। এই কাজটি করা হয় ব্যাকটেরিয়ার একাধিক কোষের সমন্বিত চেষ্টার মাধ্যমে।

Candidatus Electrothrix yaqonensis-এর বিশেষত্ব হলো এর জটিল অভ্যন্তরীণ গঠন। এর ফিলামেন্ট বা সুতোসদৃশ কাঠামোর বাইরের অংশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে অত্যন্ত পরিবাহী পেরিপ্লাজমিক ফাইবার (periplasmic fibers), যেগুলো বড়সড় খাঁজের (ridges) মধ্যে থাকে। এই খাঁজগুলো অন্যান্য পরিচিত প্রজাতির তুলনায় তিন গুণ প্রশস্ত এবং এর মধ্যে রয়েছে অনন্য নিকেল-ভিত্তিক অণু। কোষগুলোর সংযোগস্থলে একটি চাকার স্পোকের মতো দেখতে কার্টহুইল-আকৃতির গঠন এসব ফাইবারকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে, যা বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা দেয়।

গবেষকদের মতে, এই প্রজাতিটি *Ca. Electrothrix* গোষ্ঠীর একটি প্রাচীন বিবর্তনীয় শাখা হতে পারে। এর বিশেষ গঠন ও বিস্তৃত বিপাকীয় ক্ষমতা কেবল ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন ও পরিবেশভেদে তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে নতুন তথ্য দেয়।

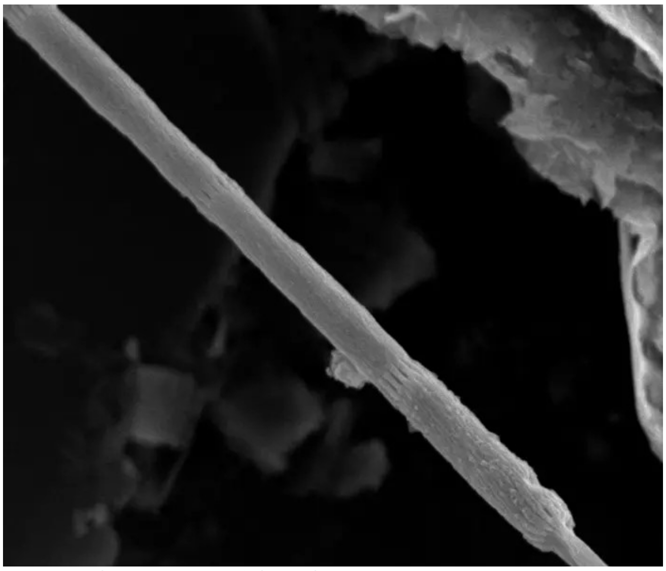

নতুন প্রজাতির কেবল ব্যাকটেরিয়ার ফিলামেন্ট (Cheng Li)

এই আবিষ্কারের ব্যবহারিক দিকও রয়েছে। এই ব্যাকটেরিয়ার প্রাকৃতিক ইলেকট্রন পরিবাহিতা তাকে বায়োরিমিডিয়েশনের (জৈব দূষণমুক্তকরণ) একটি সম্ভাবনাময় মাধ্যম করে তুলেছে, যা পলিমাটি থেকে দূষক পদার্থ সরাতে সক্ষম। পাশাপাশি, এর উচ্চ পরিবাহী নিকেল-প্রোটিন কাঠামো বায়োইলেকট্রনিক্সে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পথ দেখাতে পারে।

এই আবিষ্কার কেবল জীবজগত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়ায়নি, বরং প্রকৃতির নিজস্ব নকশার উপর ভিত্তি করে টেকসই প্রযুক্তির নতুন পথও উন্মোচন করেছে।

রেফারেন্স: *DOI: 10.1128/aem.02502-24*

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

জীবাশ্ম বিজ্ঞান

সবচেয়ে পুরোনো পিঁপড়া

দক্ষিণ আমেরিকায় নতুন আবিষ্কৃত ১১.৩ কোটি বছর পুরনো একটি পিঁপড়ার জীবাশ্ম পিঁপড়ার বিবর্তন ও বৈশ্বিক বিস্তারের ধারণা বদলে দিচ্ছে।

বেশ কয়েক মাস আগে, সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা জাদুঘরে পোকামাকড়বিদ অ্যান্ডারসন লেপেকো জীবাশ্মের সংগ্রহ ঘাঁটছিলেন, তখন একটি অদ্ভুত নমুনা তার চোখে পড়ে। নমুনাটি ছিলো চুনাপাথরে আটকে থাকা জীবাশ্ম। আর চুনাপাথরের ভেতর আটকে থাকা সেই জীবাশ্মটি ছিল একটি প্রাচীন পিঁপড়ার, আকারে প্রায় একটি পেনি কয়েনের মতো, যার ছিল কাস্তের মতো বাঁকা চোয়াল। এই প্রাণীটি তার পূর্বপরিচিত বিস্তৃতি এলাকা (উত্তর গোলার্ধ) থেকে অনেক দূরে আবিষ্কৃত হয়েছিল, এবং এর বয়স ছিল ১১.৩ কোটি বছর, যা একে আজ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন পিঁপড়া করে তুলেছে।

Current Biology জার্নালে প্রকাশিত এই আবিষ্কারটির রিপোর্ট পিঁপড়ার উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের পূর্বের ধারণা পাল্টে দিতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন নিউ জার্সি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির (New Jersey Institute of Technology) বিবর্তনবিদ ফিল বার্ডেন (তিনি এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন না)। তিনি বলেন, শুধু এই বিরল পোকাটিকে খুঁজে পাওয়াই রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়কর নয়, বরং দক্ষিণ আমেরিকায় এটি পাওয়া আরও অবাক করা বিষয়, যেখানে এতদিন খুব কম জীবাশ্মই উদ্ধার হয়েছে। বার্ডেন জানান, দক্ষিণ আমেরিকা বহুদিন ধরেই পিঁপড়ার বিবর্তনের ইতিহাসে এক বিশাল 'অন্ধকার বাক্স' ছিল — অর্থাৎ সেখানে কী ঘটেছিল তা প্রায় অজানাই ছিল।

পিঁপড়ার উৎপত্তি হয়েছিল জুরাসিক যুগের শেষভাগ ও ক্রিটেশিয়াস যুগের শুরুতে, আনুমানিক ১৬.৮ থেকে ১২ কোটি বছর আগে, যখন তারা বোলতা ও মৌমাছি থেকে পৃথক হয়। তখন পৃথিবীতে ডাইনোসররা রাজত্ব করত। এদিকে সেসময়েই পিঁপড়ারা ছড়িয়ে পড়া ও বৈচিত্র্য লাভ শুরু করে দিয়েছিল, যার মধ্যে আধুনিক পিঁপড়ের পূর্বপুরুষও ছিল। কিন্তু, জীবাশ্মের অভাবে বিজ্ঞানীরা সেই ইতিহাসের অনেক খুঁটিনাটি পূরণ করতে পারেননি।

নতুন এই জীবাশ্ম সে ঘাটতি কিছুটা পূরণ করতে সহায়তা করবে। ব্রাজিলের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্রাটো ফরমেশন (Crato Formation) থেকে উদ্ধার করা এই নমুনাটি ফ্রান্স, মিয়ানমার ও কানাডার অ্যাম্বারে পাওয়া হেল পিঁপড়া (Hell Ant)-এর তুলনায় ১.৩ কোটি বছর পুরনো। বার্ডেন জানান, এই জীবাশ্মটি একটি বিলুপ্ত পিঁপড়ে গোষ্ঠীর সদস্য, যারা আধুনিক পিঁপড়ার 'কাজিন' বা নিকটাত্মীয়।

Anderson Lepeco

এটি যে একটি হেল পিঁপড়া, তা নিশ্চিত। লেপেকো এবং তার সহকর্মীরা মাইক্রো-কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি (micro–CT) নামের একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে চুনাপাথরের ভিতরে থাকা জীবাশ্মটির ভিতরের গঠন বিশ্লেষণ করেন, এবং একটি বিশদ থ্রিডি (3D) চিত্র তৈরি করেন। এতে দেখা যায়, এই পিঁপড়ের ছিল শিংয়ের মতো গঠন ও কাস্তের মতো চোয়াল — যা আধুনিক পিঁপড়েদের মধ্যে দেখা যায় না। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো দিয়ে তারা তাদের শিকারকে গেঁথে ফেলতে পারত। গবেষকরা এই নতুন হেল পিঁপড়াকে নতুন একটি প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন *Vulcanidris cratensis.* নামটি সেই ভলকানো পরিবারকে সম্মান জানিয়ে রাখা হয়েছে, যারা এই জীবাশ্মটি জাদুঘরে দান করেছিল।

এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে পিঁপড়েরা পূর্বের ধারণার চেয়ে আরও আগে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়া হয়ে শুরু করে দিয়েছিলো এবং হেল পিঁপড়ারা সম্ভবত পিঁপড়া ও তাদের বোলতা পূর্বপুরুষদের মধ্যে এক ধরনের সংযোগ ছিল। Fossil-এর তথ্য অনুযায়ী, হেল পিঁপড়ারা সম্ভবত ছিল পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়া ও নতুন প্রজাতি গঠনের প্রথম বড় গোষ্ঠী। যেহেতু এই নতুন ব্রাজিলিয়ান জীবাশ্ম উত্তর গোলার্ধে পাওয়া হেল পিঁপড়াদের তুলনায় ১.৩ কোটি বছর পুরনো, গবেষকরা মনে করছেন দক্ষিণ আমেরিকাই ছিল হেল পিঁপড়েদের বিবর্তনের কেন্দ্র।

"পিঁপড়ার উৎপত্তি হয়েছিল আনুমানিক ১৬.৮ থেকে ১২ কোটি বছর আগে"

করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (Cornell University) পোকামাকড়বিদ ও বিবর্তনবিদ কোরি মোরো (গবেষণায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন না) বলেন, দক্ষিণ আমেরিকায় নতুন আরেকটি হেল পিঁপড়া যুক্ত হওয়ায় এখন বিজ্ঞানীরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারছেন, সেই সময়ে কত প্রজাতির পিঁপড়া ছিল এবং তারা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছিল। তার ভাষায়, "একটি মাত্র জীবাশ্ম পুরো একটি প্রাণী গোষ্ঠীর ইতিহাসের ধারণাকে নতুন করে সাজিয়ে দিতে পারে। এটা সত্যিই অভূতপূর্ব।"

সিটি স্ক্যান করে রিকনস্ট্রাক করা (Odair M. Meira)

তবে জীবাশ্মটি পিঁপড়ার বিবর্তন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য দিলেও একটি প্রশ্ন এখনো রয়ে গেছে: এত অদ্ভুত শিকারের কৌশল থাকা সত্ত্বেও হেল পিঁপড়ারা কেন বিলুপ্ত হয়ে গেল, যখন অন্য অনেক লাইনেজ টিকে রইল?

***রেফারেন্স:** DOI: [10.1016/j.cub.2025.03.023](https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.03.023)*

লেখক: ইসরাত জাহান

এপ্রিলের সেরা বিজ্ঞান ছবি

সুত্র: নেচার

বরফে ট্যাটু: ক্ষুদ্রতম শিল্পকর্ম!

এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটি টার্ডিগ্রেডের শরীরে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ‘ট্যাটু’র নিদর্শন, যা ছোট ছোট বিন্দু দিয়ে বোঝানো হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ‘আইস লিথোগ্রাফি’ নামে একটি কৌশল ব্যবহার করেছেন, যেখানে ইলেকট্রন বিমের মাধ্যমে টার্ডিগ্রেডের গায়ে বরফের স্তরে একটি নিখুঁত নকশা খোদাই করা হয়েছে। এই বিম বরফকে এক ধরনের যৌগে রূপান্তরিত করে যা টার্ডিগ্রেডের ত্বকে লেগে থাকে এবং বরফ গলে গেলেও ডিজাইনটি থেকে যায়। গবেষকরা বলছেন, এই প্রযুক্তির প্রয়োগ জৈবচিকিৎসা প্রকৌশলে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। তারা এখন আরও ক্ষুদ্র জীব, এমনকি ব্যাকটেরিয়ার গায়েও এভাবে ‘ট্যাটু’ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

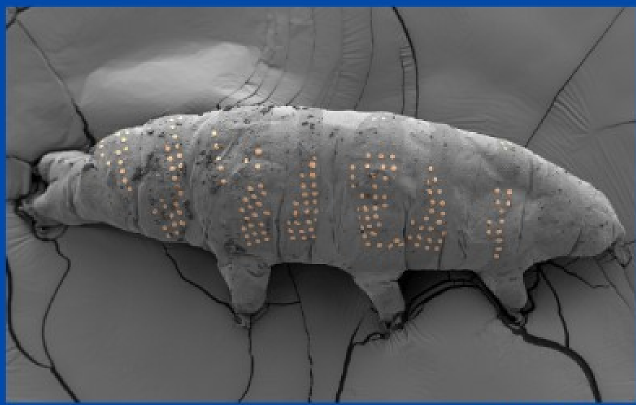

Zhao et al., Nano Letters

বসন্তের রঙে রঙিন পারাকিট

লন্ডনের সেন্ট জেমস পার্কে হালকা গোলাপি চেরি ফুলের মাঝে বসে আছে এক বর্ণিল ‘রিং-নেক পারাকিট’ (***Psittacula krameri***)। এই প্রজাতির পাখি মূলত আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার বাসিন্দা, তবে গত কয়েক দশকে লন্ডনের আকাশে তাদের দেখা যাওয়া এখন সাধারণ ব্যাপার। ধারণা করা হচ্ছে, উষ্ণ শীতকাল তাদের বিস্তারে সহায়ক হয়েছে।

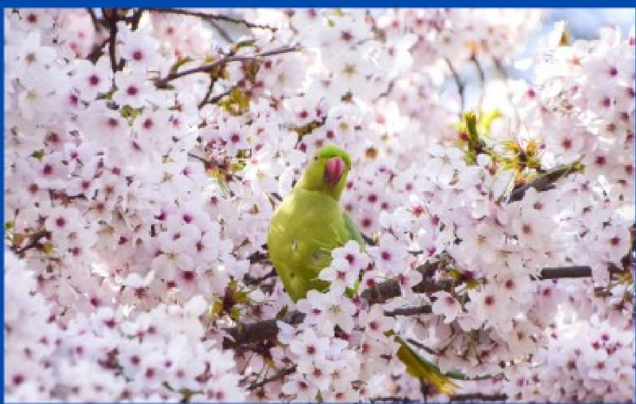

Vuk Valcic/Zuma/eyevine

মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্র

নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের তোলা ছবিতে এবার ধরা পড়েছে NGC 1514 নামের একটি গ্রহীয় নীহারিকা, যেখানে রয়েছে দুটি কেন্দ্রীয় নক্ষত্র এবং ঘন গ্যাস ও ধুলোর মেঘ, যা আওয়ার গ্লাসের মতো আকৃতি ধারণ করেছে। দৃশ্যটি তৈরি হতে সময় লেগেছে অন্তত ৪,০০০ বছর। এ সময়ের মধ্যে একটি নক্ষত্র ঠান্ডা হয়ে বাইরের স্তর থেকে পদার্থ নির্গত করে এ রূপ সৃষ্টি করেছে।

NASA, ESA, CSA, STScI, Michael Ressler (NASA-JPL), Dave Jones (IAC)

দৈত্য সন্তানের আগমন

এই প্রথমবার বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্যামেরাবন্দি করলেন একটি শিশু ‘কোলসল স্কুইড’

Schmidt Ocean Institute

(***Mesonychoteuthis hamiltoni***)। মাত্র ৩০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ এই তরুণ স্কুইড ভবিষ্যতে বেড়ে ৭ মিটার দৈর্ঘ্যে পৌঁছাবে। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের সাউথ স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের কাছে, প্রায় ৬০০ মিটার গভীরে রিমোট-কন্ট্রোলড যান এটি আবিষ্কার করে।

ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত মঠ

গত ২৮ মার্চ, ২০২৫ এ মিয়ানমারে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে হাজারো স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মান্দালয়ের 'খাত্তে কিয়াউং' মঠের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করছেন সন্ন্যাসীরা। গবেষকরা বলছেন, এটি ছিল একটি বিরল 'সুপারশিয়ার' ভূমিকম্প, যেখানে মাটির ফাটল অত্যন্ত দ্রুত ছড়ায়, ফলে ধ্বংসের মাত্রা অনেক বেশি হয়। এতে ৩,০০০-র বেশি মানুষ নিহত এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হয়।

Sai Aung Main/AFP/Getty

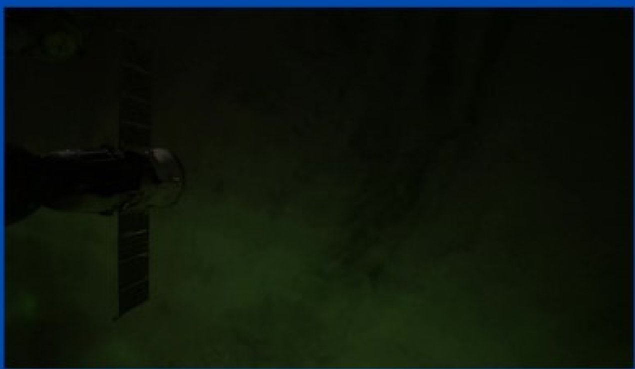

Don Pettit/NASA

আলোকিত আকাশ, মহাকাশের চোখে

নাসার মহাকাশচারী ডন পেটিট মহাকাশ থেকে ধারণ করেছেন এক অভাবনীয় সবুজ রঙের অরোরার দৃশ্য। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের উপর দিয়ে যখন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS) অতিক্রম করছিল, তখনই এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ধরা পড়ে। সূর্যের চার্জযুক্ত কণাগুলো পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে মিশে বায়ুমণ্ডলের অণুগুলোকে আয়নিত করে, যার ফলে এই ঝলমলে আলো সৃষ্টি হয়—বিশেষ করে অক্সিজেন ও ওজোন অণু থেকে সবুজ আলো জন্ম নেয়।

পৃথিবীর বন্ধু, বন রক্ষায় তরুণেরা

২২ এপ্রিল, ২০২৫ আর্থ ডে উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহ-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করে। বিশ্বের মোট ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রায় ২০% রয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়, কিন্তু নগরায়ন ও কৃষিকাজের কারণে বহু বন হারিয়ে গেছে। ২০০৪ সালের সুনামির পরও ব্যাপক পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়। এই ধরনের স্থানীয় উদ্যোগগুলো এই জীববৈচিত্র্যপূর্ণ কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ইকোসিস্টেমকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টারই অংশ।

Riska Munawarah/Reuters

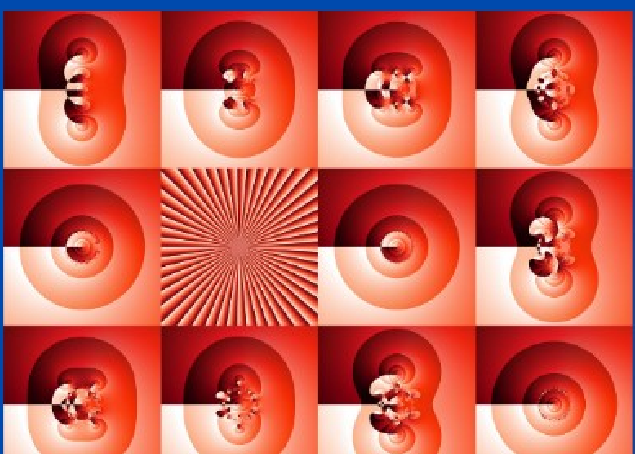

গাণিতিক সৌন্দর্যে নিখুঁত বাঁক

এই ছবিটি, যা 'আইসোজেনি' নামক একধরনের গাণিতিক ফাংশনকে ভিজ্যুয়ালি উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। সুইজারল্যান্ডের জুরিখে আইবিএম রিসার্চের একজন ক্রিপ্টোগ্রাফি গবেষক রায়ান রুয়েগার স্যাজম্যাথ (Sagemath) নামের একটি টুল ব্যবহার করে এটি তৈরি করেছেন। এই ছবিগুলি "সুপারসিঙ্গুলার এলিপটিক কার্ভ" নামক একটি বিশেষ ধরনের বস্তু কে উপস্থাপন করে। কার্ভটির বিভিন্ন ঘূর্ণন বা পাক খেয়াল করলে বোঝা যায় এর জটিলতা। এসচার-শৈলীর এই চিত্রগুলো সুইস ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের ২০২৫ সালের বৈজ্ঞানিক চিত্র প্রতিযোগিতায়

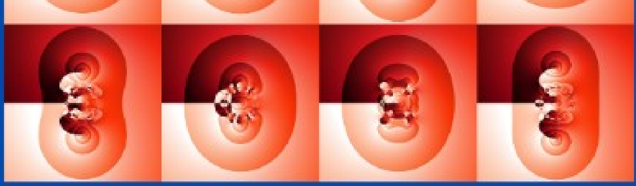

Ryan Rueger

বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

রকেট রোলআউট

গত ৮ এপ্রিল, ২০২৫ এ নাসার মহাকাশচারী জনি কিম রোসকসমসের মহাকাশচারী সের্গেই রিজিকভ ও আলেক্সেই জুব্রিটস্কির সয়ুজ রকেটে করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের (ISS) উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁরা মহাকাশে ৮ মাস অবস্থান করবেন এবং জীববিজ্ঞান, পৃথিবী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় অবদান রাখবেন। এই ছবিটিতে কাজাকিস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোমে উৎক্ষেপণপ্যাডে রকেটটিকে উল্লম্বভাবে স্থাপন করার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। তিনজনই তিন ঘণ্টার যাত্রা শেষে নিরাপদে ISS-এ পৌঁছান।

Joel Kowsky/NASA/Getty

অ্যান্টার্কটিকায় আকাশের চোখ

চীন সম্প্রতি অ্যান্টার্কটিকার ঝোংসান গবেষণা কেন্দ্রে ৩.২ মিটার অ্যাপারচারের একটি রেডিও টেলিস্কোপ উন্মোচন করেছে, যার নাম 'থ্রি গর্জেস অ্যান্টার্কটিক আই'। চরম ঠান্ডা ও প্রচণ্ড বাতাসের মধ্যে কাজ করার উপযোগী করে তুলতে গবেষকরা নানা প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন। এটি মহাকাশের গ্যাসীয় গঠন ও তারা সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

Don Pettit/NASA

কেন বিজ্ঞানবার্তা পড়বেন?

বিজ্ঞানপ্রেমীদের জন্য "বিজ্ঞানবার্তা" একটি নির্ভরযোগ্য ও সমৃদ্ধ ম্যাগাজিন, যা বিজ্ঞানের জটিল সংবাদগুলোকে সহজ ও বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করে। এই ম্যাগাজিনে আপনি পাবেন বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার, গবেষণা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও মহাকাশের বিস্ময়কর খবরগুলো একত্রে, যা আপনাকে আপডেটেড ও জ্ঞানসমৃদ্ধ রাখবে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক থেকে শুরু করে সাধারণ পাঠকেরাও এতে সমানভাবে উপকৃত হবেন। মাসিক সংখ্যাগুলোতে থাকে বিশেষ ফিচার, আকর্ষণীয় বিজ্ঞানচিত্র ও বিজ্ঞান কথা, যা পাঠকদের কৌতূহল বাড়ায় এবং বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে। "বিজ্ঞানবার্তা" শুধু তথ্যভিত্তিক নয়, বরং চিন্তার খোরাক জোগায় এবং বিজ্ঞানের মানবিক দিকগুলোও তুলে ধরে। সহজ পাঠ্যভঙ্গি ও আধুনিক উপস্থাপনা ম্যাগাজিনটিকে করে তোলে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য। তাই জ্ঞানভিত্তিক, আনন্দদায়ক ও প্রাসঙ্গিক একটি পাঠ্যসঙ্গী হিসেবে "বিজ্ঞানবার্তা" অবশ্যই আপনার পড়ার তালিকায় থাকা উচিত।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

সবচেয়ে ঠান্ডা এক্সোপ্ল্যানেট

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণে WD 1856+534 b গ্রহটিকে এখন পর্যন্ত শনাক্ত হওয়া সবচেয়ে ঠান্ডা এক্সোপ্ল্যানেট হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি একটি সাদা বামন নক্ষত্রের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে এবং গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে যে এমন গ্রহরা সাদা বামনের কাছাকাছি টিকে থাকতে পারে।

২০২০ সালে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে ৮১ আলোকবর্ষ দূরের এক নক্ষত্রের চারপাশে আবর্তনরত WD 1856+534 b নামের একটি গ্যাস জায়ান্ট গ্রহ শনাক্ত করেন। বৃহস্পতির চেয়ে প্রায় ছয়গুণ বেশি ভরের এই এক্সোপ্ল্যানেটটিকে "সুপার-জুপিটার" বলা হয়। এটি ছিল প্রথম আবিষ্কৃত গ্রহ, যা একটি সাদা বামন (White Dwarf বা WD) নক্ষত্রের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। সম্প্রতি *arXiv* প্রি-প্রিন্ট সার্ভারে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে, একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের (JWST) মিড-ইনফ্রারেড ইন্সট্রুমেন্ট (MIRI) ব্যবহার করে এই গ্রহটির পর্যবেক্ষণের বিবরণ দিয়েছে। তাদের গবেষণা নিশ্চিত করেছে, WD 1856+534 b এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে ঠান্ডা এক্সোপ্ল্যানেট।

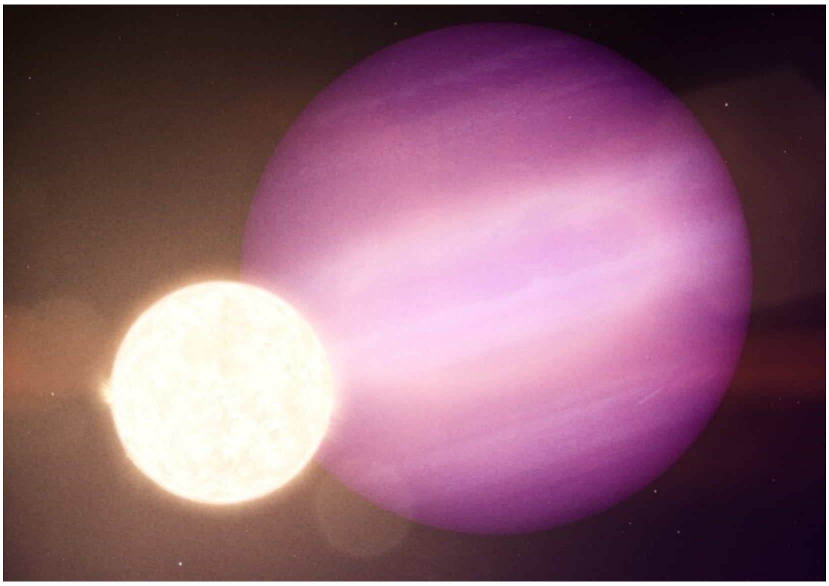

NASA's Goddard Space Flight Center

এই গবেষণার নেতৃত্ব দেন ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান, অ্যান আরবর-এর জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের সহকারী গবেষক বিজ্ঞানী মেরি অ্যান লিমব্যাক। তার সঙ্গে আরও যুক্ত ছিলেন এমআইটির কাভলি ইনস্টিটিউট ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অ্যান্ড স্পেস রিসার্চ, জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ল্যাব, ইউনিভার্সিটি অব ভিক্টোরিয়া, ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট অস্টিন, সিআইইআরএ (Center for Interdisciplinary Research and Exploration in Astrophysics), সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, ইউনিভার্সিটি অব সাউথার্ন কুইন্সল্যান্ড এবং NSF NOIRLab ও জেমিনি অবজারভেটরির গবেষকরা।

তাদের পর্যবেক্ষণ ছিল জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের Cycle 3 General Observation (GO) প্রোগ্রামের অংশ। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল ওয়েবের উন্নত ইনফ্রারেড অপটিক্স এবং স্পেকট্রোমিটার ব্যবহার করে সরাসরি গ্রহটির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। এই পদ্ধতিতে এক্সোপ্ল্যানেটের পৃষ্ঠ বা বায়ুমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত আলো সংগ্রহ করে স্পেকট্রোমিটার দিয়ে তার রাসায়নিক স্বাক্ষর বিশ্লেষণ করা হয়।

এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা সম্ভাব্য জীবনের চিহ্ন (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, মিথেন, পানি ইত্যাদি) শনাক্ত করতে পারেন এবং গ্রহের গঠন ও উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। JWST-এর মতো উন্নত প্রযুক্তির টেলিস্কোপ ব্যবহার করে, এই পদ্ধতিতে সৌরজগতের বাইরের প্রাণের সম্ভাব্য প্রথম নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। গ্রহের নির্গত আলো (emission spectra) বিশ্লেষণ করেও গ্রহের গঠন ও ভ্রাম্যমাণ ইতিহাস জানা সম্ভব হয়। তবে গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, এক্সোপ্ল্যানেট থেকে সরাসরি আলো শনাক্ত করা এখনো কঠিন কাজ, কারণ তাদের নক্ষত্রের আলো এতই তীব্র যে তা গ্রহের আলোকে ঢেকে দেয়।

ফলে, সরাসরি ইমেজিং মূলত বিশাল আকারের গ্রহ (যেমন গ্যাস জায়ান্ট) এবং প্রশস্ত কক্ষপথে থাকা বা অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রার বায়ুমণ্ডলবিশিষ্ট গ্রহগুলোর ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল। এখনো পর্যন্ত কোনো পাথুরে (পৃথিবীর মতো) গ্রহকে নক্ষত্রের কাছাকাছি কক্ষপথে সরাসরি ইমেজিংয়ের মাধ্যমে দেখা যায়নি। একইসঙ্গে, পৃথিবীর মতো শীতল (১.৮৫°সে) গ্রহের নির্গত আলোও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সাদা বামন নক্ষত্রগুলো এমন ঠান্ডা গ্রহ শনাক্ত ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেশ সুযোগ দেয়।

তাছাড়া, সাদা বামন নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহ থাকা মানে তারা নক্ষত্রের পরিণত জীবনধারার মধ্যেও টিকে থাকতে পারে কি না এবং সেখানে বসবাসযোগ্য পরিবেশ টিকে থাকার সম্ভাবনা আছে কি না, এসব বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ওয়েবের ক্ষমতা ব্যবহার করে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজছেন। এই গবেষণায়, লিমব্যাক ও তার সহকর্মীরা JWST-এর MIRI ডেটা ব্যবহার করে ইনফ্রারেড এক্সেস (IR excess) পদ্ধতিতে WD 1856+534 b গ্রহের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।

এই পদ্ধতিতে তারা গ্রহটির ভর নির্ধারণ এবং তার বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে সক্ষম হন। বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রহটির গড় তাপমাত্রা ১৮৬ কেলভিন (-৮৭°সে), যা এটিকে এখন পর্যন্ত শনাক্ত হওয়া সবচেয়ে ঠান্ডা এক্সোপ্ল্যানেট হিসেবে নিশ্চিত করে। পাশাপাশি, তারা নিশ্চিত করেন যে গ্রহটির ভর বৃহস্পতির ভরের ছয়গুণের বেশি নয়, যেখানে পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণে এর ভর ১৩.৮ বৃহস্পতি ভর হিসেবে অনুমান করা হয়েছিল। তাদের এই ফলাফল প্রথমবারের মতো সরাসরি প্রমাণ দিল যে, গ্রহরা সাদা বামন নক্ষত্রের চারপাশের হ্যাবিটেবল জোনের নিকটবর্তী কক্ষপথেও টিকে থাকতে পারে।

গবেষক দল ২০২৫ সালে নির্ধারিত WD 1856 b-এর আরও বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আশা করা হচ্ছে, তখন হয়তো নতুন গ্রহেরও সন্ধান মিলবে, যা জানাবে WD 1856 b কীভাবে তার বর্তমান কক্ষপথে পৌঁছেছে। এছাড়া, JWST-এর Cycle 1 এ Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) ব্যবহার করে করা পর্যবেক্ষণের ফলাফলও শিগগির প্রকাশিত হবে, যা গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবে।

রেফারেন্স: *DOI: 10.48550/arXiv.2504.16982*
লেখক: ইরতা আমালিয়া

জীববিজ্ঞান

নতুন দুটি কুমির প্রজাতির সন্ধান

নিওট্রপিকাল কুমিররা বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে, যাদের জনসংখ্যা উপকূলীয়, স্থলভাগ এবং দ্বীপাঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে আছে। নতুন এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এই কুমির দলের মধ্যে আশ্চর্যজনক জেনেটিক বৈচিত্র্য আবিষ্কার করেছেন এবং দুটি নতুন প্রজাতি চিহ্নিত করেছেন — একটি কোসুমেল দ্বীপে এবং অন্যটি ইউকাটান উপদ্বীপের কাছে বানকো চিনচোরো অ্যাটলে।

ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা মেক্সিকান বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপের উপকূলে অবস্থিত কোজুমেল দ্বীপ এবং বানকো চিনচোরো এটলে দুটি নতুন কুমির প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন। তাদের গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি *Molecular Phylogenetics and Evolution* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, যা আমেরিকান কুমির (*Crocodylus acutus*) নিয়ে বহুদিনের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং সংরক্ষণের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর নতুন করে আলোকপাত করেছে।

প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা থেকে কুমিররা প্রথম নিওট্রপিক অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়ে আজকের বিদ্যমান (নিওট্রপিক অঞ্চলে) চারটি প্রজাতিতে রূপ নিয়েছে (*Crocodylus acutus, Crocodylus moreletii, Crocodylus*

intermedius, Crocodylus rhombifer)। আমেরিকান কুমির তার বিস্তৃত আবাসস্থলের জন্য পরিচিত। এটি হাইপারস্যালাইন উপকূলীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে মিঠা পানির এলাকাতেও বাস করে — ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিওট্রপিক অঞ্চলে। কিছু অঞ্চলে এটি অন্য তিনটি কুমির প্রজাতির সঙ্গে সহাবস্থানও করে। বর্তমানে, আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (IUCN) আমেরিকান কুমির (*Crocodylus acutus*)-কে "ঝুঁকিপূর্ণ" তালিকাভুক্ত করেছে, যেখানে এর সাথে সম্পর্কিত দুইটি প্রজাতি "গভীরভাবে বিপন্ন" হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে।

McGill University

ড. হান্স লারসনের নেতৃত্বে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান গবেষকদল নির্জন ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলিতে কুমিরের প্রকৃত বৈচিত্র্য অন্বেষণের উদ্যোগ নেয়। তারা কোজুমেল ও বানকো চিনচোরোর কুমিরদের জিনগত উপাদান বিশ্লেষণ করে এবং ক্যারিবিয়ান, মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোর প্রশান্ত উপকূলের অন্যান্য কুমিরদের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পান, এসব দ্বীপের কুমিরদের মধ্যে জিনগতভাবে অত্যন্ত উচ্চমাত্রার পার্থক্য রয়েছে। এই প্রমাণ থেকে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছান, এগুলি শুধুমাত্র আমেরিকান কুমিরের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নয়, বরং সম্পূর্ণ নতুন দুটি আলাদা প্রজাতি। তবে, এখনো এদের আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো নাম দেওয়া হয়নি।

গবেষকরা শারীরিক গঠনেরও বিশ্লেষণ করেছেন, যা এই অঞ্চলের কুমির জনগোষ্ঠীর জিনগত ও শারীরিক উভয় বৈচিত্র্যের ওপর প্রথম বিস্তৃত গবেষণা। তাদের কাজ ইঙ্গিত দেয়, ক্যারিবিয়ানে কুমিরের জীববৈচিত্র্য দীর্ঘদিন ধরেই অবমূল্যায়িত হয়েছে।

নতুন আবিষ্কৃত উভয় প্রজাতির আবাসস্থল অত্যন্ত সীমিত এবং প্রতিটির প্রজননক্ষম সদস্যের সংখ্যা এক হাজারেরও কম। যদিও বর্তমান জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। তবে তাদের ছোট পরিসর এবং সীমিত সংখ্যার কারণে তারা পরিবেশগত হুমকির প্রতি খুবই বেশি সংবেদনশীল, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নের কারণে তাদের আবাসস্থল ধ্বংসের ঝুঁকি রয়েছে।

গবেষকদলের মতে, বৈশ্বিকভাবে জীববৈচিত্র্যের দ্রুত বিলুপ্তি বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের গতি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই নতুন কুমির প্রজাতিগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া তাদের রক্ষার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। কোজুমেল ও বানকো চিনচোরো দ্বীপে ভূমি উন্নয়ন সীমিত করা এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণে উদ্যোগ নেওয়া এই বিরল সরীসৃপদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য অত্যাবশ্যক।

রেফারেন্স: DOI: 10.1016/j.ympev.2025.108341

লেখক: ফারিহা রহমান পারু

প্রযুক্তি

পোক্সিয়াও

চীনের একদল গবেষকরা 'পোক্সিয়াও' নামে এক ধরনের আলট্রাফাস্ট ফ্ল্যাশ মেমোরি ডিভাইস তৈরি করেছেন, যা প্রচলিত মেমোরির চেয়ে প্রায় ১ লাখ গুণ দ্রুত ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে। এটি ভবিষ্যতে কম্পিউটার ও এআই প্রযুক্তিতে বিপ্লব ঘটাতে পারে, তবে বাজারে আসতে এখনও অন্তত এক দশক লাগবে।

ফুদান ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক সম্প্রতি গবেষণাগারে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির একটি ফ্ল্যাস মেমোরি ডিভাইসের প্রোটোটাইপ তৈরি করেছেন, যার নাম দিয়েছেন পোক্সিয়াও (Poxiao) যার অর্থ ভোরের আলো। চালের দানার মতো ছোট এই মেমোরি ডিভাইসের ডেটা ট্রান্সফারের গতি অবিশ্বাস্যভাবে ৪০০ পিকোসেকেন্ড (এক সেকেন্ডের এক লাখ কোটি ভাগের এক ভাগ)।

বর্তমানে প্রচলিত মেমোরি কার্ড বা ফ্ল্যাশ মেমোরিতে (যেমন মোবাইল বা পেনড্রাইভে ব্যবহৃত) যেখানে ডেটা লিখতে বা মুছতে মিলিসেকেন্ড সময় লাগে, সেখানে পোক্সিয়াও ডিভাইস প্রায় ১ লাখ গুণ দ্রুত গতির হবে। গবেষকরা দাবি করেছেন, এর গতি মানুষের মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের গতির অনেকটা কাছাকাছি হবে।

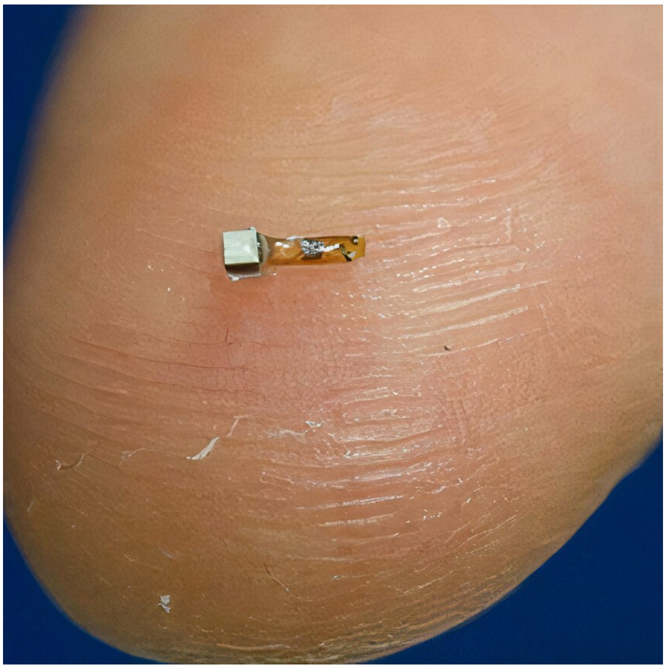

SCMP

বর্তমান কম্পিউটার প্রযুক্তিতে মেমোরি এবং প্রসেসর আলাদা থাকে। এর ফলে ডেটা আদান-প্রদানে কিছুটা হলেও সময় লাগে, যাকে "ভন নিউম্যান বটলনেক" বলা হয়। ফুদান ইউনিভার্সিটির গবেষকদের মতে, পোক্সিয়াও প্রযুক্তি সফল হলে এই সীমাবদ্ধতা অনেকটাই দূর করা সম্ভব হবে।

এই মেমোরি ডিভাইস একইসঙ্গে দ্রুত ডেটা সংরক্ষণ ও সরাসরি সেই ডেটা দিয়ে প্রসেসিং চালাতে পারবে। এর ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), চালকবিহীন গাড়ি, হাসপাতালের রিয়েল-টাইম ডেটা বিশ্লেষণসহ নানা ক্ষেত্রে মুহূর্তেই বিশাল তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব হবে বলে গবেষকরা আশা প্রকাশ করেছেন। তবে এ দাবি এখন পর্যন্ত অনেকটাই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্বাভাস মাত্র।

গবেষকদের মতে, পোক্সিয়াও প্রযুক্তি যদি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে ভবিষ্যতের কম্পিউটার বা স্মার্ট ডিভাইসের গতি অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে যাবে। এটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে, কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে পারবে, এমনকি ব্রেইন কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI) প্রযুক্তিতেও এক নতুন বিপ্লবের সূচনা করতে পারে।

বর্তমানে এই প্রোটোটাইপ মাত্র কয়েক কিলোবাইট ডেটা সংরক্ষণ করতে সক্ষম। অথচ বাস্তব জীবনের ডিজিটাল ডিভাইসে টেরাবাইট পরিমাণের (হাজার গিগাবাইটের) ডেটা প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয়। গবেষকরা স্বীকার করেছেন, বড় আকারে উৎপাদনযোগ্য করতে হলে ডিভাইসটির ডেটা ধারণক্ষমতা বাড়ানো এবং শক্তি সাশ্রয়ী করে তুলতে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

গবেষকরা নতুন এই প্রযুক্তি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও বাস্তবে এটি এখনো গবেষণাগারের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী হয়ে বাজারে আসতে এটি আরও হয়ত প্রায় এক দশক সময় নিতে পারে। সুতরাং, ল্যাব পর্যায়ে পরীক্ষামূলক সাফল্য পাওয়া গেলেও এই প্রযুক্তিকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া মোটেও সহজ কাজ হবে না। বরং এর জন্য দীর্ঘ সময় ব্যাপী গবেষণা ও উন্নয়নের প্রয়োজন হতে পারে।

লেখক: সিরাজুর রহমান

জ্যোতির্বিজ্ঞান

গ্র্যাভিটেশনাল স্লিংশট দিয়ে স্যাটেলাইট উদ্ধার

চীনের দুটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সময় কক্ষপথে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। পরে ১২৩ দিন চেষ্টা করে প্রকৌশলীরা গ্র্যাভিটেশনাল স্লিংশট কৌশল ব্যবহার করে সেগুলো সফলভাবে উদ্ধার করেন। এই সাফল্য ভবিষ্যতের স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

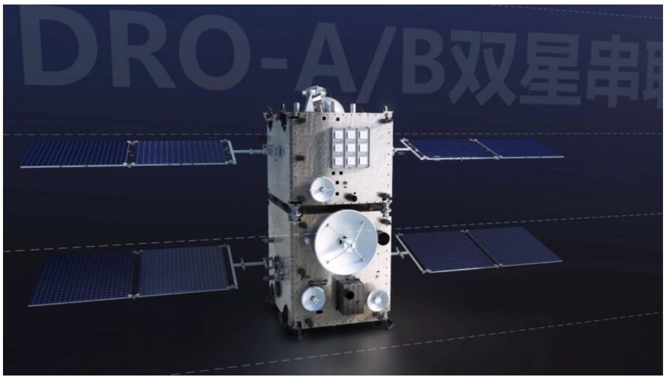

Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU)

গত ১৫ মার্চ, ২০২৫ এ বেইজিং সময় রাত ৮টা ১৫ মিনিটে চীন লং মার্চ-২সি (Long March-2C) রকেটের মাধ্যমে দুটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। রকেটের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ সফল হলেও, তৃতীয় বা 'আপার স্টেজ'-এ একটি কারিগরি ত্রুটির কারণে স্যাটেলাইট দুটি নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। এরপর কয়েক মাস ধরে স্যাটেলাইট দুটিকে রক্ষা করার নানা প্রচেষ্টা চালান প্রকৌশলীরা। একসময় তারা সেগুলোকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নামিয়ে এনে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনাও করে।

CGTN–এর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উৎক্ষেপণের ১২৩ দিন পর 'গ্র্যাভিটেশনাল স্লিংশট' পদ্ধতির মাধ্যমে স্যাটেলাইটগুলোকে সফলভাবে 'উদ্ধার' করা হয়। সহজভাবে বললে, প্রকৌশলীরা পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের অভিকর্ষ বল ব্যবহার করে স্যাটেলাইটগুলোর গতি ও দিক নির্ধারণ করে সেগুলোকে ঠিক কক্ষপথে নিয়ে যান। এই প্রচেষ্টায় শুধু মিশনই বাঁচে না, বরং এটি গভীর মহাকাশে নেভিগেশনের জন্য একটি সম্ভাব্য যুগান্তকারী কৌশল হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। আবার যেহেতু স্যাটেলাইট দুটি এমন একটি নেটওয়ার্কের অংশ, যা পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণে সক্ষম, তাই এই মিশন প্রযুক্তিগত দিক থেকেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এই উদ্ধারের নেতৃত্ব দেন চীনের Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU)-এর গবেষক ঝাং হাও। CGTN Digital-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "এটি ছিল আমার প্রথম উৎক্ষেপণ মিশন, এবং আমি প্রথমে কোনো সমস্যা হবে তা ভাবিনি। যদি স্যাটেলাইট দুটি ধ্বংস হয়ে যেত, তাহলে আমাদের বহু বছরের পরিশ্রম এবং বিনিয়োগ সবই নষ্ট হতো। এটা দলের জন্য মানসিকভাবে অনেক বড় আঘাতও হতো। সৌভাগ্যক্রমে তা হয়নি। আমরা দুটি দলে ভাগ হয়ে কাজ করেছি—এক দল স্যাটেলাইটের থ্রাস্টার নিয়ন্ত্রণ করে তার ঘূর্ণন কমানোর কাজ করে, আর আমার দল সেগুলোকে সঠিক পথে ফেরানোর জন্য সর্বোত্তম কক্ষপথ গণনা করে।"

"প্রকৌশলীরা পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের অভিকর্ষ বল ব্যবহার করে স্যাটেলাইটগুলোকে ঠিক কক্ষপথে নিয়ে যান।"

উদ্ধার করা DRO-A এবং DRO-B স্যাটেলাইট দুটি পূর্বে উৎক্ষেপণকৃত DRO-L স্যাটেলাইটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি কনস্টেলেশন (নেটওয়ার্ক) তৈরি করেছে, যা মহাকাশযানের জন্য নেভিগেশন সেবা দেবে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতের মহাকাশযানগুলোর অবস্থান মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে জানা যাবে, যেখানে এখনকার পদ্ধতিতে ২–৩ দিন সময় লাগে।

CSU-এর আরেক গবেষক মাও জিনইউয়ানের মতে, এই প্রযুক্তি মহাকাশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যান নিয়ন্ত্রণে (autonomous piloting) নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। অটোনমাস পাইলটিং প্রযুক্তি চীনের ২০৩০ সালে চাঁদে মানুষ পাঠানো এবং প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক চন্দ্র গবেষণা কেন্দ্র (ILRS)-এর জন্য পে-লোড পাঠানোর মতো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলোর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

লেখক: ইরতা আমালিয়া

মহাকর্ষ বল কি গণনামূলক প্রক্রিয়ার ফল?

পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ মেলভিন ভপসন মহাকর্ষ নিয়ে ভাবার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করছেন। তিনি বলছেন মহাকর্ষ শুধুমাত্র কোনো বলই নয়, বরং এমন একটি প্রক্রিয়া যা ঘটে যখন মহাবিশ্ব নিজেকে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

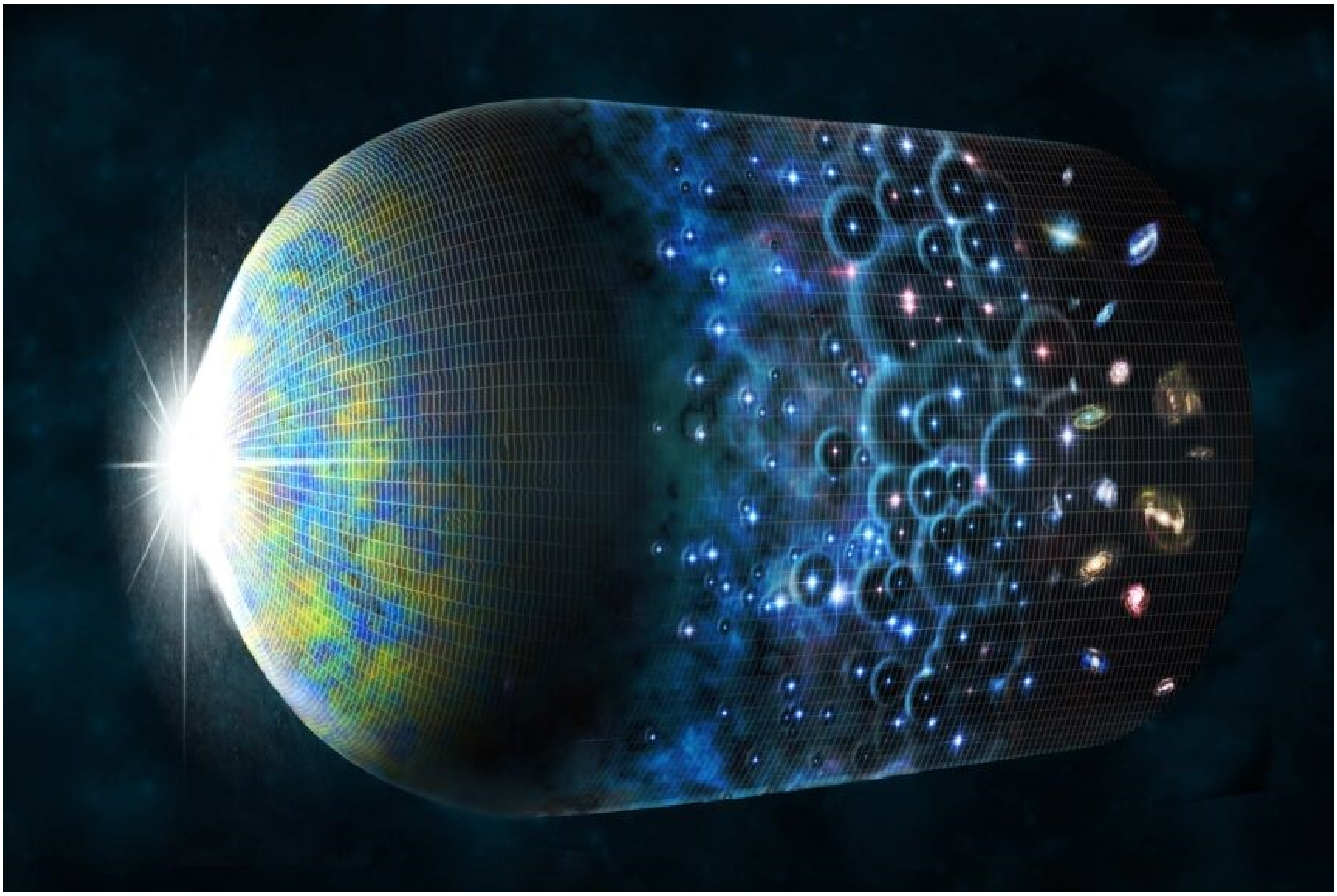
M. Weiss/CfA

আমরা সবাই জানি, নিউটনের সূত্র মতে দুটি বস্তুর মধ্যে একটি আকর্ষণজনিত বল কাজ করে — যাকে আমরা মহাকর্ষ বলি। পরে আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে দেখান, এই বল আসলে মহাকাশ-সময়ের বক্রতাজনিত একটি প্রভাব। কিন্তু নতুন এক গবেষণায় পদার্থবিদ ড. মেলভিন ভপসন জানাচ্ছেন এক বিস্ময়কর ব্যাখ্যা: মহাকর্ষ আসলে কোনো মৌলিক বল নয়, এটি হতে পারে মহাবিশ্বের ভেতরে চলমান এক ধরণের গণনামূলক প্রক্রিয়ার ফসল!

ড. ভপসনের এই তত্ত্ব ইনফরমেশন ফিজিক্স (Information Physics) নামক একটি ক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এই ধারায় বিশ্বাস করা হয় যে, বাস্তবতা শুধুই বস্তুগত নয়, বরং এটি একটি গঠিত তথ্যের কাঠামো — অনেকটা বিশাল এক কম্পিউটার সিমুলেশনের মত, যেখানে সমস্ত কিছুর আচরণ নির্ধারিত হয় কিছু নির্দিষ্ট কোড ও তথ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

তথ্যের সংকোচন থেকেই মহাকর্ষ?

ভপসনের মতে, বস্তুগুলোর মধ্যে যে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ দেখা যায়, তা আসলে মহাবিশ্বের তথ্যকে অপটিমাইজ বা সংক্ষেপ করার একটি কৌশল। তার ভাষায়, মহাবিশ্ব যেন "ঘর গুছিয়ে নিচ্ছে" অর্থাৎ এনট্রপি কমাতে বস্তুগুলোকে গুচ্ছবদ্ধ করে রাখছে, যাতে একাধিক জায়গায় না ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে, বস্তুগুলো একত্রিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় — যাকে আমরা মহাকর্ষ বলেই জানি।

তাঁর গবেষণায় বলা হয়েছে, মহাশূন্যকে যদি অসংখ্য ক্ষুদ্র "প্রাথমিক কোষে" ভাগ করা যায়, তবে প্রতিটি কোষ হয় ফাঁকা (০) নাহলে বস্তুযুক্ত (১)। এগুলো ০ এবং ১ হিসাবে বাইনারি

তথ্য ধারণ করে। যখন একাধিক কণা আশেপাশের কোষে অবস্থান করে, তখন তথ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোকে এক কোষে এনে তথ্যসংখ্যা কমিয়ে ফেলা যায়। এটি অনেকটা কম্পিউটার গেম বা সিমুলেশনে রিসোর্স ব্যবহারে দক্ষতা আনার কৌশলের মত।

তথ্য, ভর এবং মহাবিশ্ব

ড. ভপসনের আগের গবেষণাগুলোতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে তথ্যের নিজস্ব ভর থাকতে পারে, এবং মৌলিক কণাগুলো জীবকোষের ডিএনএ-এর মতো করে তথ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম। এবার তিনি এটিও দাবি করছেন যে মহাবিশ্বের "কোড" বা তথ্যভিত্তিক কাঠামোর কারণেই বস্তুগুলো একত্রিত হয় — যেন মহাবিশ্ব একটি সুবিন্যস্ত, কম বিশৃঙ্খল তথ্যভাণ্ডার হিসেবে নিজেকে বজায় রাখে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে মহাকর্ষ কোনো দূরপাল্লার মৌলিক বল নয়, বরং একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যা মহাবিশ্বের নিজস্ব প্রোগ্রামিং রুলস অনুযায়ী কাজ করে চলা একটি গণনামূলক প্রক্রিয়ার অংশ। এতে ধারণা করা যায় যে মহাকর্ষীয় বল আসলে তথ্য এনট্রপি হ্রাসের ফল, যাতে মহাশূন্যের কোডিং এবং পার্টিকল ট্র্যাকিং সহজ হয়।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও প্রশ্ন

ভপসন মনে করেন, এই মডেল প্রচলিত তত্ত্বগুলোর থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন এবং এর বড় প্রভাব পড়তে পারে ব্ল্যাক হোল, ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি এবং কোয়ান্টাম তথ্যতত্ত্বে। তবে, তিনি এটাও স্বীকার করেন যে এই তত্ত্ব এখনো গবেষণার পর্যায়ে, এবং এটি ভবিষ্যতে কতটা গৃহীত হবে বা ব্যবহারিক ফলাফল দেবে — তা সময়ই বলে দেবে।

তবুও, ড. ভপসনের এই গবেষণা তথ্যতত্ত্বের আলোকে বাস্তবতাকে নতুনভাবে কল্পনা করার প্রয়াসেরই অংশ। মহাবিশ্বের প্রকৃত গঠন ও কার্যপ্রণালী বুঝতে হলে আমাদের চিন্তার সীমানা ভাঙতে হবে — আর এই ধরনের কাজ সেটাই করছে।

রেফারেন্স: DOI: [10.1063/5.0264945](https://doi.org/10.1063/5.0264945)
লেখক: আরবিনা শেখ

সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজ্ঞানবার্তা

@bigganbartafb @bigganbarta @bigganbarta @bigganbarta

বিজ্ঞানবার্তা

bigganbarta.org